বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ

মাসিক কমপিউটার জগৎ

THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the ICT Movement in Bangladesh

আগস্ট ২০২৪ বছর ৩৪ সংখ্যা ০৪

August 2024 YEAR 34 ISSUE 04

অ্যামাজন স্টোরফ্রন্ট

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপযোগী শিক্ষায় জোর দিতে হবে

কমপিউটার জগৎ-এর খবর

ফ্রিল্যান্সিং এক উদীয়মান ও প্রতিশ্রুতিশীল পেশা

উদীয়মান প্রযুক্তিতে দক্ষ করে

জনশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে

Lexar™

INDUSTRY-LEADING
MEMORY SOLUTIONS

FLASH DRIVE | SSD | RAM

Global Brand

মাসিক কমপিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh
প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা ডা: এম এম মোরতায়েজ আমিন
নির্বাহী সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল হক অনু
প্রধান নির্বাহী মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী সালেহ উদ্দিন মাহমুদ
বিশেষ প্রতিনিধি ইমদাদুল হক

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা সিঙ্গাপুর

প্রচ্ছদ সমর রঞ্জন মিত্র
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহ্‌তেশাম উদ্দিন
জ্যেষ্ঠ সম্পাদনা সহকারী মনিরুজ্জামান সরকার পিন্টু
অঙ্গসজ্জা সমর রঞ্জন মিত্র
রিপোর্টার স্থপতি বদরুল হায়দার
রিপোর্টার সোহেল রানা

মুদ্রণে : মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
২৭৮/৩, এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক সাজ্জাদ হোসেন
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের

যোগাযোগ :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪

Executive Editor Mohammad Abdul Haque Anu
Chief Executive Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent Md. Abdul Hafiz
Correspondent Md. Masudur Rahman

Published from :
Computer Jagat
Room No. 11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 9183184

Published by : Nazma Kader
Tel : 9664723, 9613016
E-mail : info@computerjagat.com.bd

সম্পাদকীয়

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা অত্যন্ত জরুরি

তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতিতে মানুষের জীবন দিন দিন হয়ে উঠছে সহজ ও গতিশীল। আর এ গতিশীল পথ সহজ করার অন্যতম উপায় হলো দ্রুতগতির নেটওয়ার্কিং সিস্টেম। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু দেশে সাবমেরিন কেবলের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। যে কারণে কোনো একটি কেবল কাটা পড়লে কিংবা কোনো কারণে সাময়িক বন্ধ থাকলে ইন্টারনেট সেবা ব্যাহত হয়। সম্প্রতি 'সি-মি-উই ৫' সাবমেরিন কেবল ইন্দোনেশিয়া অংশে কাটা পড়েছে। এতে বাংলাদেশসহ ১৬টি দেশ এ কেবলে যুক্ত থাকলেও সেবা ব্যাহত হচ্ছে শুধু বাংলাদেশে। খাতসংশ্লিষ্টদের মতে, এর পেছনে দায়ী অপর্যাপ্ত সাবমেরিন কেবলের ওপর নির্ভরশীলতা।

একাধিক বিকল্প না থাকায় যেকোনো দুর্ঘটনায় দেশে ইন্টারনেট সেবা ব্যাহত হয়। বাকি দেশগুলোয় পর্যাপ্ত বিকল্প সাবমেরিন কেবল থাকায় এ সেবা ব্যাহত হচ্ছে না। দেশে সাবমেরিন কেবল মোটে দু'টি। প্রথম সাবমেরিন কেবল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া-মধ্যপ্রাচ্য-পশ্চিম ইউরোপ ৪ 'সি-মি-উই ৪'। বর্তমানে সমুদ্রের তলদেশের এই কেবলের মাধ্যমে প্রায় ৮০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ সরবরাহ করা হয়, যা ২০০৬ সালে বাংলাদেশে সংযুক্ত হয়েছিল।

আর দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল 'সি-মি-উই ৫'। এর সক্ষমতা ১ হাজার ৬০০ জিবিপিএস, যা দেশের প্রথম সাবমেরিন কেবলের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। 'সি-মি-উই ৫' কেবলটি সিঙ্গাপুর থেকে ৪৪০ কিলোমিটার পশ্চিমে ইন্দোনেশিয়া অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে বন্ধ হয়ে যায় সিঙ্গাপুর অভিমুখী সব ধরনের ট্রাফিক। এ অবস্থায় দেশের ৯০ শতাংশ ডাটা ট্রাফিক সিঙ্গাপুরভিত্তিক হওয়ায় এবং অধিকাংশ কোম্পানি সিঙ্গাপুরের সার্ভার ব্যবহার করায় ইন্টারনেট সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে, বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে দেশে ইন্টারনেট সেবাপ্রাপ্তিতে।

এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে কেবলের সংখ্যা বাড়ানো উচিত। কেবলের সংখ্যা বেশি হলে সেগুলো দিয়ে পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক রাখা সম্ভব। পাশাপাশি সার্ভার বেছে নেয়ার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। দেশে সার্ভার স্থাপন করা যায় কিনা তা নিয়ে কাজ করা জরুরি। আমাদের প্রায় সব ডাটা সেন্টার সিঙ্গাপুরভিত্তিক। ফলে ৯০ শতাংশ ডাটা ট্রাফিক সিঙ্গাপুরকে ঘিরে হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ায় কেবল কাটা পড়ায় সিঙ্গাপুরের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় অতিরিক্ত ডাটা ভারত হয়ে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে। টেলিযোগাযোগ খাতের বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান টেলিজিওগ্রাফির তথ্য অনুযায়ী, 'সি-মি-উই ৫'-এর সঙ্গে ১৬টি দেশ ১৮টি ল্যান্ডিং স্টেশনের মাধ্যমে যুক্ত। ১৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশই সবচেয়ে কম সাবমেরিন কেবলে যুক্ত। টেলিজিওগ্রাফির হিসাব অনুযায়ী, প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার চারটি সাবমেরিন কেবলে যুক্ত। মালয়েশিয়া সাবমেরিন কেবলের ল্যান্ডিং স্টেশন ২৯টি।

সিঙ্গাপুর যুক্ত ৩৮টিতে আর ইন্দোনেশিয়া নিজে ৬৫টি কেবলের মাধ্যমে সংযুক্ত। এছাড়া শ্রীলংকা ও পাকিস্তান যথাক্রমে নয়টি ও দশটি সাবমেরিন কেবলে যুক্ত। বাংলাদেশেও সাবমেরিন কেবলের সংখ্যা বাড়াতে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিতে হবে। কেননা ইন্টারনেটের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্কও জড়িত। শিগগিরই এ সমস্যা সমাধান না হলে এবং এর বিকল্প তৈরি না হলে অর্থনৈতিকভাবে বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সাধারণ ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেট ব্যবহারে খুব বেশি সমস্যার সম্মুখীন না হলেও ফ্রিল্যান্সার এবং দেশের বাইরের কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধভাবে কাজ করা কোম্পানিগুলোর কাছে নিরবচ্ছিন্ন সেবা না পাওয়া বেশ ভোগান্তির। এতে আর্থিকভাবে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। দেশে ব্যান্ডউই-ডথের চাহিদা এবং জোগান সমপর্যায়ে রয়েছে। ফলে একদিকে আমাদের কোনো উদ্বৃত্ত নেই, অন্যদিকে আমাদেও কোনো বিকল্প সোর্স নেই। যার কারণে দু'টি কেবলের একটি কাটা পড়ায় এ সংকট তৈরি হয়েছে এবং এটি দীর্ঘায়িত হবে।

বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবলস কোম্পানি (বিএসসি) সূত্রে জানা যায়, বিচ্ছিন্ন হওয়া কেবল মেরামত করতে ইন্দোনেশিয়া সরকারের অনুমতি লাগবে। সবকিছু ঠিকঠাক করে ইন্টারনেটের গতি ফিরে পেতে প্রায় অনেক সময় লাগে।

লেখক সম্পাদক
• প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম • সৈয়দ হাসান মাহমুদ • সৈয়দ হোসেন মাহমুদ • মো: আবদুল ওয়াজেদ

cudy

WHOLE HOME MESH

300Mbps Multi-Mode 5 in 1 Mesh Router

Router | Access Point | Extender | WISP | Mesh Satellite Multi-mode

5-In-1 Multi-Mode

WIREGUARD

2x2MIMO

Call For Details:
+880 1977 476 546

Global Brand

মাসিক কমপিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh
বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত তথ্য প্রযুক্তি ম্যাগাজিন
আগস্ট ২০২৪ বছর ৩৪ সংখ্যা ০৪

সূচিপত্র

Advertisers' INDEX
02 Global Brand
04 Global Brand
46 UCC

৩. সূচিপত্র

৫. সম্পাদকীয়

৬. উদীয়মান প্রযুক্তিতে দক্ষ করে জনশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে

একবিংশ শতাব্দীর এ পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে বিশ্বদরবারে দাঁড়াতে চাইলে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন তথা জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল দেশের জন্য এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, বর্তমান এ তথ্যপ্রযুক্তির যুগে জ্ঞানের ভিত্তিতেই কেবল এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে একটি উৎপাদন-শীল জনশক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের ফলে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সব সুবিধা আজ আমাদের হাতের নাগালে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে আমাদের এ অবস্থানে পৌঁছানোর পথ খুব সহজ ছিল না। ডিজিটাল প্রযুক্তির বহুমাত্রিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচকে শক্ত অবস্থানে পৌঁছেছে। সারা বিশ্ব এ মুহূর্তে একটি প্রযুক্তিগত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যাকে আমরা বলছি চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের জীবনমানকে আরও সহজতর করা। এর ফলে আমাদের জীবনযাত্রা এবং পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের পথ ও পদ্ধতিগুলো মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সবকিছুই ইন্টারনেট ও ইন্টারনেটকেন্দ্রিক স্মার্ট ডিভাইসের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ছোঁয়া শুধুমাত্র প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নয়, আমাদের জীবনধারণের সব ক্ষেত্রকেই পরিবর্তন করে দিচ্ছে।
ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন **হীরেন পণ্ডিত**।

১৪. ফ্রিল্যান্সিং এক উদীয়মান ও প্রতিশ্রুতিশীল পেশা

অনলাইন শ্রমবাজার বা ফ্রিল্যান্সিং খাতে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। মোট অনলাইন শ্রমবাজার বাংলাদেশের অংশ প্রায় ১৬ শতাংশ। গত এক বছরে দেশে ই-কমার্স খাতেও প্রায় এক লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ৭ লাখ মানুষ ফ্রিল্যান্সিংয়ের সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে বসে বিশ্বের উন্নত দেশের কাজ করতে শুরু করে। তবে বিদেশ থেকে টাকা আনা নিয়ে হাজারও ঝক্কি পোহাতে হয়, যেগুলো এখন অনেকটাই ঠিক হয়ে এসেছে। কিন্তু এগুলো আরও ১০ বছর আগেই ঠিক হয়ে যেতে পারত। শুধু নীতিগত কারণে পিছিয়ে যাওয়া। বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সিং ক্ষেত্রে বেশ ভালো একটি জায়গা করে নিয়েছে। এ কাজটিতে বাংলাদেশ আরও ভালো করতে পারত, যদি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেটের ভালো গতি পৌঁছে দেয়া যতো এবং ডিজিটাল পেমেন্টাকে সহজতর করা যেতো।
এ দশকেও বাংলাদেশ তার ইন্টারেনেটের গতি ঠিক করতে পারেনি। বাংলাদেশের মানুষ দুই উপায়ে ইন্টারনেট পেয়ে থাকে। একটি হলো ফাইবার অপটিক ব্রডব্যান্ড, আরেকটি হলো মোবাইল ইন্টারনেট। বাংলাদেশে পরিকল্পিত উপায়ে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠেনি। ঢাকার চেয়ে জেলা শহরগুলোতে ইন্টারনেটের গতি কম। সরকারের ঘোষিত এক দেশ এক রেট এর সফল বাস্তবায়ন। বাংলাদে-শের তথ্যপ্রযুক্তি খাত এখনো ঢাকাকেন্দ্রিক। ঢাকায় কিছু কিছু এলাকা ফাইবারের আওতায় এসেছে। কিন্তু সেগুলো আন্তর্জাতিক মানের করতে হবে। ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন **হীরেন পণ্ডিত**।

১৮. অ্যামাজন স্টোরফ্রন্ট

বিশ্বজুড়ে ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার সম্পদ মূল্যের যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান 'অ্যামাজন.কম' তাদের সেলার হওয়ার সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে বৃহৎ কোম্পানিগুলোকে অফলাইন মার্কেটের পাশাপাশি অনলাইন জগতে বাজার প্রসারের সুযোগ দেয়ার মধ্যে দিয়ে ব্যবসার অবস্থান সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। আর বিক্রেতাদের একটি শক্তিশালী টুল হিসেবে 'অ্যামাজন স্টোর ফ্রন্ট' আবির্ভূত হয়েছে, যেই ডিজিটাল স্পেস ব্যবসাগুলোকে একটি ব্র্যান্ডেড অনলাইন স্টোর তৈরির অবস্থান তৈরি করে দিয়েছে অ্যামাজন ওয়েবসাইটের মধ্যে, যা কাস্টমারদের ভালো একটি কেনাকাটার অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন **নাজমূল হাসান মজুমদার**।

২৫. চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপযোগী শিক্ষায় জোর দিতে হবে

একটি জাতির সামগ্রিক সমৃদ্ধি অর্জন ও অগ্রগতির প্রশ্নে শিক্ষার যথাযথ বিকাশ জরুরি। আর সেই লক্ষ্যে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। প্রসঙ্গত, বিশ্বের নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে দেশে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যের কথা জানিয়েছেন নীতি নির্ধারকবৃন্দ। যত টাকা লাগে আমাদের তা বিনিয়োগ করতে হবে। যত নামিদামি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে- তারা কীভাবে শিক্ষা দেয়, কী কারিকুলাম শেখায়, কীভাবে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে, আমাদের তা অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশে তৈরি করতে হবে। ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন **রাশেদুল ইসলাম**।

২৮. কমপিউটার জগৎ খবর

উদীয়মান প্রযুক্তিতে দক্ষ করে জনশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে

হীরেন পণ্ডিত

একবিংশ শতাব্দীর এ পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে বিশ্বদরবারে দাঁড়াতে চাইলে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন তথা জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল দেশের জন্য এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, বর্তমান এ তথ্যপ্রযুক্তির যুগে জ্ঞানের ভিত্তিতেই কেবল এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে একটি উৎপাদনশীল জনশক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের ফলে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সব সুবিধা আজ আমাদের হাতের নাগালে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে আমাদের এ অবস্থানে পৌঁছানোর পথ খুব সহজ ছিল না। ডিজিটাল প্রযুক্তির বহুমাত্রিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচকে শক্ত অবস্থানে পৌঁছেছে।

সারা বিশ্ব এ মুহূর্তে একটি প্রযুক্তিগত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যাকে আমরা বলছি চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের জীবনমানকে আরও সহজতর করা। এর ফলে আমাদের জীবনযাত্রা এবং পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের পথ ও পদ্ধতিগুলো মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সবকিছুই ইন্টারনেট ও ইন্টারনেটকেন্দ্রিক স্মার্ট ডিভাইসের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ছোঁয়া শুধুমাত্র প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নয়, আমাদের জীবনধারণের সব ক্ষেত্রকেই পরিবর্তন করে দিচ্ছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বান্ধব পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশল গ্রহণে ডিজিটাল বাংলাদেশের উদ্যোগগুলোকে সমন্বিত করা হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিকস, মেশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অব থিংস, ব্লকচেইন, ন্যানোটেকনোলজি, থ্রিডি প্রিন্টিংয়ের মতো আধুনিক ও নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি, স্বাস্থ্যসেবা, যোগাযোগ, কৃষি, শিক্ষা, বাণিজ্য, পরিবহন, পরিবেশ, অর্থনীতি, গভর্ন্যান্সসহ বিভিন্ন খাত অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করছে। তারুণ্যের মেধা, উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার বিকাশ এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং উদ্ভাবনী জাতি গঠন।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও বাংলাদেশের কৃষি

ব্রাজিল চিনি, সয়াবিন, গরু ও মুরগির মাংস, তুলা, কফিসহ অনেক পণ্যের শীর্ষ রপ্তানিকারক। বাংলাদেশের এসব পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, কাজেই ব্রাজিলের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের এই সময়ে নীতিনির্ধারকদেরও হতে হবে চৌকশ এবং দূরদর্শী। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের সুফল কতটা ঘরে তুলতে পেরেছি, সেটি বিশ্লেষণ করতে হবে নির্মোহভাবে। শিল্পবিপ্লবের ইতিহাসে তিনটি বিপ্লবের কথা বলা হয়। ১৭৬০ সালে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রথম শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। ১৮৭০ সালে বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ফলে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়। বিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহার মানুষকে এনে দেয় সহস্র

বছরের গতি। ফলে উৎপাদন শিল্পে আসে আমূল পরিবর্তন। তৃতীয় শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয় ১৯৬০ সালে তথ্যপ্রযুক্তি উদ্ভবের ফলে। কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রযুক্তি বিভিন্ন শিল্প খাতে আনে অভাবনীয় পরিবর্তন। শিল্পের বিকাশে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষি। কিন্তু যন্ত্র কি কৃষিতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেনি? ইতিহাস বলে লাঙলই ছিল কৃষির প্রথম যন্ত্র। পরে ধীরে ধীরে আধুনিক থেকে আধুনিকতর হয়েছে কৃষিযন্ত্র। এখন উন্নত কৃষি মানেই যন্ত্রনির্ভর কৃষি। জমি তৈরি থেকে ফসল বপন, ফসল তোলা, সংরক্ষণ এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে যন্ত্রের ব্যবহার নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ধরন ও ধারণ। শুধু যন্ত্রই এখন শেষ কথা নয়।

এই যন্ত্রের ব্যবহার স্বয়ংক্রিয় করে তোলাটিই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক প্রয়াস। ইউরোপের দেশগুলো খাদ্য ফসল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কিন্তু প্রযুক্তি উৎকর্ষে তারা এগিয়ে। জার্মানিতে কৃষক পর্যায়ে দেখা যায় অত্যাধুনিক কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার। আর এই জার্মানিতেই সূচিত হয়েছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ধারণা। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবটি মূলত ডিজিটাল বিপ্লব। পূর্ববর্তী শিল্পবিপ্লবগুলোর ক্ষেত্রে মানুষ যন্ত্রকে পরিচালনা করছে; কিন্তু চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সময়ে যন্ত্র নিজেই নিজেকে পরিচালনা করছে। প্রতি বছর চীনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কৃষি যন্ত্রপাতি মেলায় দেখা যা সব। সেখানে বিভিন্ন সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে আগামী দিনের কৃষিযন্ত্র নিয়ে পৃথিবীর কৃষি প্রকৌশলী এবং বিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনা ও গবেষণাও উঠে আসে সেখানে।

কৃষিযন্ত্রের মাঠ প্রদর্শনীতে চীনের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলো এখন ইউরোপের পাশাপাশি এশিয়ার দেশগুলোকে মাথায় রেখে স্বয়ংক্রিয় সব কৃষিযন্ত্র তৈরি ও উন্নয়ন করছে। ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত চীনের কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির বৃহৎ প্রতিষ্ঠান লোভোলের নতুন যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা এর উদাহরণ। লোভোল হচ্ছে কৃষি, নির্মাণ, ও অবকাঠামো যন্ত্রাংশ ছাড়াও ভারী ও বৃহৎ যানবাহন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চীনের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। এটি উচ্চতর প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান হিসেবেও চালকের আসনে। ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই লোভোল কোম্পানির কর্মীর সংখ্যা ১৬ হাজারের বেশি। লোভোল ১২০টি দেশে তাদের আধুনিকতম কৃষিযন্ত্র সরবরাহ করছে। দানবাকার বিশাল ট্রাক্টর থেকে রোবটাকৃতির কীটনাশক ছিটানোর যন্ত্র, স্বয়ংক্রিয় ড্রোন রয়েছে এর মধ্যে।

চীনের বিশাল কৃষি খামারগুলোর জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের চাহিদা বাড়ছে। শুধু চীনেই নয়, তাদের বাজার এখন পৃথিবীজুড়ে। বাংলাদেশের মতো দেশের যেখানে খণ্ড খণ্ড ভূমি রয়েছে, সেখানে এত বিশাল আকারের কৃষিযন্ত্র ব্যবহারের সুযোগ নেই, এ নিয়ে তাদের কোনো বিকল্প চিন্তা আছে কি না? এ প্রশ্নের জবাবে খুব কৌশলী ছিলেন সান ডেমিং জানান, আপাতত আমরা ক্ষুদ্র কৃষকের জন্য কৃষিযন্ত্র তৈরির কথা ভাবছি না। চীনের অন্য কোম্পানিগুলো ছোট যন্ত্র তৈরি করছে। তবে বাজারে বড় চাহিদা তৈরি হলে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি তৈরিতেও লেগে যাব। লোভোল কোম্পানি কৃষিশিল্পের যন্ত্রপাতির বাজারটা নিয়েই আগ্রহী। কারণ আগামীর কৃষি যে শিল্পের কৃষি সে সত্য তারা বেশ ভালোভাবেই বুঝেশুনে নিয়েছে।

বিশ্বব্যাপীই কৃষির যান্ত্রিকীকরণ নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে পৃথিবী। কার চেয়ে কে কতটা উন্নতি সাধন করতে পারে চলছে সেই প্রতিযোগিতা। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায় এই মুহূর্তে যান্ত্রিকীকরণের যে তথ্যটি সবচেয়ে আগে আমাদের সামনে আছে তা হলো, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য ভর্তুকিতে কৃষিযন্ত্র বিতরণের লক্ষ্যে ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার সরকারি প্রকল্প চলছে। ২০২৫ সালের মধ্যে এর সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের ৬৪টি জেলার প্রায় সব উপজেলায় কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকায়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করছে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ। এই বিপুল অংকের প্রকল্পের সঙ্গে আমাদের যান্ত্রিকীকরণের উৎকর্ষ, গবেষণা, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সংযুক্তিকরণের জায়গাটি কোথায়। শুধু কৃষিযন্ত্র কেনা নয় এসব উন্নয়ন ও উৎকর্ষের জায়গাতেও কাজ করতে হবে। আমাদের কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বড় সাফল্যটি হিসাব করা হয় জমি কর্ষণে। পৃথিবীর প্রাচীনতম আবিষ্কার ভূমি কর্ষণের ক্ষেত্রে এখন থেকে শত বছর আগে এই ভূমিতে যে ট্রাক্টর এসেছিল, সেই জায়গাতে আমরা শতভাগের কাছাকাছি ব্যবহার পূর্ণ করতে পেরেছি ধরে নেওয়া হয়। যদিও দুর্গম এমন অঞ্চলও রয়েছে যেখানে এখনো ট্রাক্টর পৌঁছেনি।

দেশের কৃষি যান্ত্রিকীকরণের চিত্র হলো জমি চাষে ৯৫ ভাগ, সেচ ব্যবস্থায় ৯৫, ফসল তোলা বা হারভেস্টে ১.৫, ধান মাড়াইয়ে ৯৫, রোপণে দশমিক ৫ ভাগেরও কম। মূল সংকটের জায়গাটি এখানেই। ফসল উৎপাদন-পূর্ববর্তী যান্ত্রিকীকরণে যে অগ্রগতি অর্জন করেছি, উৎপাদন ও তার পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণে পিছিয়ে থাকায় আমাদের বিপুল পরিমাণ ফসলের ক্ষতি হচ্ছে।

যান্ত্রিক কৃষি বলতে আমরা শুধু বুঝি কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার। কিন্তু কৃষি শুধু ধান-গম বা শাকসবজি নয়। গবাদি পাখি ও প্রাণীর লালনপালন বা মৎস্য খাতেও যে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়াতে হবে সে কথাটা আমরা তেমনভাবে ভাবছি না। অথচ চীন-জাপান থেকে শুরু করে উন্নত বিশ্বের অনেক দেশই কৃষির খাত-উপখাতগুলোতে যন্ত্রের ব্যবহার যেমন নিশ্চিত করেছে তারা দারুণভাবে এগিয়ে গেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারেও।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষক গরুর খামারে আইওটি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে কীভাবে একাই কম খরচে কম সময়ে বিশাল একটি খামার পরিচালনা করেন সেটি দেখলে সবার অবাক হবার কথা। আমাদের দেশের কৃষিযন্ত্র প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর তৎপরতা রয়েছে তবে তা উল্লেখযোগ্য নয়। সিলেট শহরের বিসিক শিল্পনগরীতে বেসরকারি পর্যায়ে দেশের অন্যতম বৃহৎ কৃষিযন্ত্র প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান আলিম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ১৯৬৫ সালে ছোট এক ওয়ার্কশপ

থেকে যাত্রা শুরু করে এই কোম্পানি এখন দেশের কৃষিক্ষেত্রের বর্তমান ও আগামীর চাহিদা বিবেচনা করে কৃষিযন্ত্র প্রস্তুত করছে। কৃষিযন্ত্রের সঙ্গে আধুনিকতম প্রযুক্তি সংযুক্তির বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হচ্ছে আমাদের স্থানীয় কোম্পানিগুলো সে বিষয়ে ভাবতে হবে। কৃষি আর আগের মতো থাকছে না, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

যান্ত্রিকীকরণের উৎকর্ষই এই পরিবর্তনের জায়গাটি দখল করছে। এখানকার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেটি গভীরভাবেই বিবেচনায় আনতে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় সরকারি সহযোগিতায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া জরুরি। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো কিছুটা পথ হাঁটলেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন কিংবা স্মার্ট কৃষির পথে আমাদের কোনো রকম অগ্রগতি নেই বললেই চলে। নেই তেমন কোনো গবেষণা কিংবা প্রচেষ্টা। ফলে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের কৃষিতে আমাদের নিজস্ব অংশগ্রহণের প্রশ্নে আমাদের অবস্থান অনেক দূরে। একই সঙ্গে ভর্তুকির বিষয়ে আমাদের নজর দিতে হবে ক্ষুদ্র কৃষিযন্ত্রের প্রতিও। কেননা বড় বড় কৃষিযন্ত্রে যে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে তার শতভাগ সুফল প্রান্তিক কৃষক পর্যায়ে পৌঁছায় না। ধারণা করা হয়, বিশ্ব জনসংখ্যা ২০৫০ সালে গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ১০ বিলিয়নে। ২০৫০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যাও গিয়ে দাঁড়াতে পারে ২৫ কোটির কাছাকাছি। যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সব মানুষের খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করতে ২০৫০ সাল পর্যন্ত শস্য উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ করতে হবে। একদিকে খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানোর চ্যালেঞ্জ অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বিরূপ পরিস্থিতিতে টিকে থাকার চ্যালেঞ্জ।

খাদ্য নিরাপত্তায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার জরুরি

ফসলে নতুন নতুন রোগ জীবাণুর আক্রমণ-কৃষিতে এমন সব নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে চাহিদার ভিত্তিতে নতুন ও অধিকতর কার্যকর প্রযুক্তির ব্যবহার করা জরুরি। গবেষকরা বলছেন, কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আইওটি, ন্যানো প্রযুক্তি, কাটিংঅ্যাজসহ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় চতুর্থ শিল্পবিপ্লব উপযোগী জনবল তৈরিতে গুরুত্ব দিতে হবে। নেদারল্যান্ডসের বিশ্ববিদ্যালয় ও চীনের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওশান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আগামীর কৃষি নিয়ে কীভাবে প্রস্তুত হচ্ছে। আমরা তাদের তুলনায় এখনো অনেক অনেক পিছিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক্রমের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ জনবল তৈরি করতে হবে, না হলে ১০ বছর পর এ খাতে টিকে থাকতে দক্ষ জনশক্তি আমদানি করতে হবে।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো আধুনিক প্রযুক্তিকে দ্রুত কাজে লাগাচ্ছে বাণিজ্যিক স্বার্থে। এর জন্য সুদূরপ্রসারী গবেষণা, মাঠপর্যায়ে পর্যবেক্ষণসহ যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশসহ গোটা দক্ষিণ এশিয়ার কৃষি পরিস্থিতি মাথায় রেখে প্রস্তুত হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রস্তুত হচ্ছে চীন। এখানে সব মিলিয়ে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কৃষিযন্ত্রের বিশাল একটি বাণিজ্যিক ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। আমরা কৃষি যন্ত্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষে এগিয়ে না যেতে পারলে শুধু ক্রেতা হিসেবেই আধুনিক প্রযুক্তির সুফল ভোগ করতে হবে। প্রযুক্তিগত জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের প্রশ্নে সবার সমান অধিকার রয়েছে। এই অধিকার নিয়ে আমাদেরও শামিল হওয়া দরকার অত্যাধুনিক কৃষির মিশনে।

তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে জিওইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি

পৃথিবীতে অব্যাহত তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে পরিবেশের ওপর যে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। পৃথিবীতে অব্যাহত তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে পরিবেশের ওপর যে বিরূপ প্রভাব পড়ছে, তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে জীবজগতের। মানব জাতির জীবন বিলাসিতা এবং অতিরিক্ত প্রযুক্তিনির্ভর হওয়ায় বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব ও পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় পরিবেশের এই দুর্দশা। বিশেষজ্ঞদের মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে অতিমাত্রায় পারমাণবিক বোমার তেজস্ক্রিয়তার ফলে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আধিক্য বেড়ে যাওয়ায় সামগ্রিক পরিবেশের ওপর এই ক্ষতিকর দুর্যোগ নেমে আসে।

জলবায়ু বিশেষজ্ঞ এবং পরিবেশবিদরা তখন থেকেই বায়ুমণ্ডলে কার্বনের পরিমাণ কমানোর জন্য জিওইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। জিওইঞ্জিনিয়ারিং বলতে বোঝায় উদীয়মান প্রযুক্তির একটি সেট, যা পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব রাখতে পারে। জিওইঞ্জিনিয়ারিং প্রচলিতভাবে দু'টি বিস্তৃত বিভাগে বিভক্ত। প্রথমটি হলো, কার্বন জিওইঞ্জিনিয়ারিং- যা প্রায়ই কার্বন-ডাই-অক্সাইড অপসারণ (সিডিআর) করা বোঝায়। অন্যটি হলো, সোলার জিওইঞ্জিনিয়ারিং- যা সৌর বিকিরণ ব্যবস্থাপনা (এসআরএম) অ্যালবেডো পরিবর্তন।

বড় পার্থক্য হচ্ছে– কার্বন জিওইঞ্জিনিয়ারিং বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইডের ঘনত্বের লিংকটি ভেঙ্গে দেয়, যা তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা হ্রাস করে। আর সৌর জিওইঞ্জিনিয়ারিং সূর্যালোকের একটি ছোট ভগ্নাংশকে মহাশূন্যে প্রতিফলিত করতে বা গ্রহকে শীতল করার জন্য মহাকাশে ফিরে আসা সৌর বিকিরণের পরিমাণ বাড়াতে সহায়তা করে।

উল্লেখযোগ্য জিওইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিগুলো হলো- স্ট্র্যাটোস্ফেয়ারিক অ্যারোসল ইনজেকশন, যা আগত সূর্যালোকের বিরুদ্ধে প্রতিফলিত বাধা হিসাবে কাজ করার জন্য স্ট্রাটোস্ফিয়ারে বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তর, প্রচুর পরিমাণে সালফার কণা যেমন- সালফার ডাই-অক্সাইড স্প্রে করাকে বোঝায়। এই প্রযুক্তিতে আর্টিলারি বন্দুক থেকে বা বিমানের পেছনের অংশ থেকে কণা (যেমন-টাইটানিয়াম বা অ্যালুমিনিয়াম) নিক্ষেপ করা, আকাশে বড় পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ব্যবহার করা বোঝায়।

সারফেস অ্যালবেডো পরিবর্তন- অ্যালবেডো হলো একটি পরিমাপ, যা একটি পৃষ্ঠকে আঘাত করে আলো শোষিত না হয়েই প্রতিফলিত হয়।

জলবায়ুর পরিপ্রেক্ষিতে, অ্যালবেডো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি পৃথিবীর পৃষ্ঠ দ্বারা শোষিত সৌরশক্তির পরিমাণকে প্রভাবিত করে। তুষার এবং বরফের মতো উচ্চ অ্যালবেডোসহ পৃষ্ঠগুলো মহাকাশে ফিরে আরও সৌরশক্তি প্রতিফলিত করে, যা জলবায়ুর ওপর শীতল প্রভাব ফেলে। বিপরীতভাবে, কম অ্যালবেডোসহ পৃষ্ঠগুলো, যেমন- অন্ধকার বন বা মহাসাগর, বেশি সৌরশক্তি শোষণ করে, যা জলবায়ুর ওপর উষ্ণতার

প্রভাব ফেলে। তাই অ্যালবেডোর পরিবর্তন মেরু বরফের ক্যাপ গলে যাওয়া বা ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনে পৃথিবীর জলবায়ুর ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে।

মেরিন ক্লাউড ব্রাইটনিং হলো, গ্লোবাল ওয়ার্মিং মোকাবিলা করার জন্য একটি প্রস্তাবিত জিওইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল। এটি সামুদ্রিক স্ট্র্যাটোকুমুলাস মেঘ সাধারণত মহাসাগরের ওপর ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জলের ফোঁটাগুলোকে প্রবর্তন করে আরও সূর্যালোক প্রতিফলিত করে। এই প্রতিফলন তাত্ত্বিকভাবে আগত সূর্যালোকের একটি ছোট অংশকে মহাকাশে ফেরত পাঠায় এবং দূষণের কণার কারণে সৃষ্ট একটি প্রাকৃতিক শীতল প্রভাব তৈরি করে।

মাইক্রোবাবল- সাগরে লাখ লাখ ক্ষুদ্র বায়ু বুদবুদ তৈরি করে সমুদ্রের আলোকে প্রতিফলিত করে, যা জলবায়ুর সামগ্রিক শীতলতা তৈরি করে। কার্বন ক্যাপচার এবং স্টোরেজ (সিসিএস) সাধারণত বিদ্যুৎকেন্দ্র বা অন্যান্য শিল্প উৎস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের যান্ত্রিক ক্যাপচার বোঝায়। কার্বন-ডাই-অক্সাইড সাধারণত ধোঁয়া থেকে নির্গমনের আগে ক্যাপচার করা হয়। তরল কার্বন-ডাই-অক্সাইড অতঃপর দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয়ের জন্য ভূগর্ভস্থ জলে পাম্প করা হয়। ফলে ভূপৃষ্ঠের ওপরে তাপমাত্রা অনেকটা সহনীয় পর্যায়ে থাকতে সহায়তা হয়।

ডাইরেক্ট এয়ার ক্যাপচার– যা বাতাস থেকে সরাসরি কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ বা অপসারণে কার্যকর। এই পদ্ধতিতে রাসায়নিক এবং যান্ত্রিক উপায়ে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস নিষ্কাশন করা হয়। সাধারণত একটি রাসায়নিক সরবেন্ট এবং বড় ফ্যান ব্যবহার করে একটি ফিল্টারের মাধ্যমে বাতাস চলাচল করে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড তখন সিসিএস বা ইওআর বা অন্যান্য ব্যবহারের জন্য গ্যাসের প্রবাহ হিসাবে পাওয়া যায়।

মহাসাগর নিষিক্তকরণ বলতে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করার জন্য কম জৈবিক উৎপাদনশীলতাযুক্ত অঞ্চলে লোহা চূর্ণ আয়রন সালফেট হিসাবে বা অন্যান্য পুষ্টি উপাদান যেমন- ইউরিয়া সমুদ্রে ফেলে দেওয়াকে বোঝায়। ফলস্বরূপ ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন বায়ুমণ্ডলীয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড টেনে নিয়ে সমুদ্রের তলদেশে নিক্ষেপ করে বা মেরে ফেলে।

কৃত্রিম আপওয়েলিং- এই পদ্ধতিও অনেকটা মহাসাগর নিষিক্তকরণের মতো। এখানে কৃত্রিমভাবে পুষ্টিসমৃদ্ধ গভীর সমুদ্রের জলকে পৃষ্ঠে পরিবহন করত ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন বায়ুমণ্ডলীয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ ও সঞ্চয় করে। ফলে মৃত ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন বায়োমাস সমুদ্রের তলদেশে ডুবে যায়। বর্ধিত সালোকসংশ্লেষণ– শ্যাওলা, ধান, গম, তুলা এবং গাছের মতো ফসলকে জেনেটিক্যালি এমনভাবে ম্যানিপুলেট করা হয়, যাতে তারা আরও কার্বন-ডাই-অক্সাইড বিপাক করতে পারে। অরবিটাল আয়না এবং সানশেড– এই পদ্ধতিতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে কয়েক মিলিয়ন ছোট প্রতিফলিত বস্তু স্থাপন করাকে বোঝায়।

এই ঘনীভূত বস্তুর ক্লাস্টার আংশিকভাবে পুনর্নির্দেশিত বা আগত সৌর বিকিরণ ব্লক করতে পারে। বস্তুগুলো রকেট থেকে উৎক্ষেপণ করে সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে একটি স্থিতিশীল ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান পয়েন্টে অবস্থান করে ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান পয়েন্টগুলো হলো মহাকাশের বিভিন্ন অবস্থান। এর কার্যকরী ভূমিকা হলো অন্তর্মুখী সৌর বিকিরণ হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে বৈশ্বিক বায়ু তাপমাত্রা হ্রাস পাবে।

ক্লাউড-সিডিং–তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের প্রাচীনতম কৌশলগুলোর মধ্যে একটি হলো ক্লাউড সিডিং। এটি একটি আবহাওয়া পরিবর্তন প্রক্রিয়া, যা বৃষ্টি বহনকারী মেঘে সিলভার আয়োডাইড বা কঠিন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের কণা বিচ্ছুরিত করে শুকনো কৃষি জমিতে বৃষ্টি আনার চেষ্টা করে। এই পদ্ধতিতে আকাশে বিদ্যমান মেঘগুলোকে আরও বৃষ্টি তৈরির জন্য প্রভাবিত করে। এটির জন্য উড়োজাহাজ দিয়ে সিলভার আয়োডাইডের ছোট ছোট কণা মেঘের মাঝে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর খুব সহজেই জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পরিণত হয় বৃষ্টিতে।

পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড কমানোর এই পদ্ধতিগুলো খুবই ব্যয়বহুল এবং বিতর্কিত। সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি হলো– প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, বেশি করে গাছ লাগানো, জলাশয়, নদী এবং সমুদ্রের প্রবাহ স্বাভাবিক রাখা। এগুলো ভূপৃষ্ঠ থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও ক্লোরোফ্লোরো কার্বন জাতীয় ক্ষতিকর গ্যাস শোষণ করে মানুষসহ প্রাণ ও প্রকৃতি বাঁচতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শুধু আমাজন বনই বছরে ৬০ কোটি টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড ভূপৃষ্ঠ থেকে শোষণ করে। আর সমুদ্রগুলো বছরে ৩০০ কোটি টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড ভূপৃষ্ঠ থেকে শোষণ করে থাকে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সারা পৃথিবী যেখানে টেকসই উন্নয়নের পথে ধাবিত হচ্ছে, সেখানে তথাকথিত উন্নয়নের নামে আমরা প্রতিনিয়ত বৃক্ষ নিধন, নদী ও জলাশয় ভরাট করে ইমারত বা ইটভাঁটি নির্মাণ করে পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলছি।

পরিবেশের ক্রমবর্ধমান অবনতি মানব জাতি ও সমস্ত প্রাণিকুলের জন্য কতটুকু হুমকিস্বরূপ, তা আমরা এখন বেশ টের পাচ্ছি। একটি দেশের মোট আয়তনের ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকার কথা থাকলেও বাংলাদেশে আছে মাত্র ১৬ শতাংশ। রাজধানী ঢাকায় বনভূমি বা গাছপালার পরিমাণ মাত্র ২ শতাংশ, যা ধীরে ধীরে আরও কমে যাচ্ছে। অন্যান্য শহরও এর ব্যতিক্রম নয়।

গবেষকরা বলছেন, বিগত ১০০ বছরে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা দশমিক ৩ ডিগ্রি থেকে দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে এই শতক শেষে পৃথিবীর তাপমাত্রা গড়ে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বেড়ে যেতে পারে। তাই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে গাছই হতে পারে মানুষের সবচেয়ে নিরাপদ, নীরব ও সাশ্রয়ী কাণ্ডারি। একটি গাছ বছরে গড়ে ২৬০ পাউন্ড অক্সিজেন নির্গত করে।

তরুণদের আইসিটি সেক্টরে দক্ষ করে তুলতে হবে

বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে। ২০২৫ সালের শেষের দিকে বা ২০২৬ সালের প্রথম দিকে এই শিল্পবিপ্লব ঘটবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শিল্পবিপ্লব এমন এক প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যা উৎপাদনের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। শিল্পের কাঠামো ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সার্বিক, আমূল ও আকস্মিক পরিবর্তনের সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সম্মিলিত রূপই শিল্পবিপ্লব।

শিল্পবিপ্লবের ফলে মানুষের জীবনে নানা ধরনের পরিবর্তন আসে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব হবে প্রযুক্তিগত শিল্পবিপ্লব। মানুষের যে কাজ করতে দিনের পর দিন লেগে যায়, প্রযুক্তির উন্নতির কারণে সে কাজ কয়েক মিনিটে হয়ে যাবে। প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল ১৭৮৪ সালে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের মাধ্যমে। বিদ্যুৎ আবিষ্কার হয় ১৮৭০ সালে। ফলে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব ত্বরান্বিত হয় এবং তৃতীয় শিল্পবিপ্লব ঘটে ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেট আবিষ্কারের মাধ্যমে। ইন্টারনেটের আবিষ্কার শিল্পবিপ্লবের গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। তবে আগের তিনটি শিল্পবিপ্লবকে ছাড়িয়ে গেছে আজকের যুগের ডিজিটাল বিপ্লব, যাকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

ডিজিটাল বিপ্লবকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব হিসেবে প্রথম সংজ্ঞায়িত করেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের চেয়ারম্যান ক্লাউস সোয়াব তার লেখা 'দ্য ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশন' গ্রন্থে। ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত এই গ্রন্থে তিনি চতুর্থ শিল্পবিপ্লব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরবর্তী সময়ে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এ ধারণার ব্যাপক প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেয়। তারও আগে ২০১১ সালে একদল জার্মান বিজ্ঞানী শিল্প কলকারখানাগুলোয় কীভাবে অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা যায় বা ডিজিটাল কৌশল প্রয়োগ করা যায়, তা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। যেখানে কম জনবল দিয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পণ্য উৎপাদন সহজ হবে। সেখান থেকেই মূলত চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ধারণাটির উদ্ভব।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই তরুণ। এ দেশের কর্মসংস্থানেও তারুণ্যের ভূমিকা রয়েছে অসামান্য। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মতে, তরুণ জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ভারতে ৩৫ কোটি ৬০ লাখ, চীনে ২৬ কোটি ৯০ লাখ, ইন্দোনেশিয়ায় ৬ কোটি ৭০ লাখ, যুক্তরাষ্ট্রে ৬ কোটি ৫০ লাখ, পাকিস্তানে ৫ কোটি ৯০ লাখ এবং বাংলাদেশে রয়েছে ৪ কোটি ৭৬ লাখ। এই তরুণেরাই বাংলাদেশের সব ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে চলেছে। আজও বাংলাদেশের সব অভূতপূর্ব সৃষ্টিগুলোর জন্মই দেন তরুণেরা। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে দেশ গঠনেও তরুণদের ছিল ইতিবাচক ভূমিকা। গান, কবিতা, আবৃত্তি, নাচ, খেলাধুলা, সাহিত্য আড্ডা, ছাত্ররাজনীতি সবকিছুতে তাদের ছিল প্রধান বিচরণক্ষেত্র। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের সব ক্ষেত্রে চরম দৈন্য লক্ষ্যণীয়। না আছে খেলার মাঠ, না আছে পৃষ্ঠপোষক, না আছে সাহিত্য আড্ডা, না সুস্থধারার সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) আঞ্চলিক কর্মসংস্থান নিয়ে প্রতিবেদন অনুযায়ী, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি পাকিস্তানের ১৬.৮ শতাংশ। বাংলাদেশে এই হার ১০.৭ শতাংশ, যা এই অঞ্চলের ২৮টি দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। দেশে তরুণদের বিশেষত শিক্ষিত তরুণদের এক বৃহদাংশ বেকার জীবন যাপন করছে এবং সেটা বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের হার সবচেয়ে বেশি। প্রতি ১০০ জন স্নাতক ডিগ্রিধারীর মধ্যে ৪৭ জনই বেকার। অর্থাৎ, প্রতি দুই জনে এক জনের নাম বেকারের খাতায় অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা ৩ কোটি। প্রতিষ্ঠানটি আভাস দিয়েছে, কয়েক বছরে তা দ্বিগুণ হয়ে ৬ কোটিতে দাঁড়াবে, যা মোট জনসংখ্যার ৩৯.৪০ শতাংশ হবে। আইএলওর হিসাবটিকেই পর্যবেক্ষকেরা বাংলাদেশের প্রকৃত বেকারের সংখ্যা বলে মনে করেন।

২০১৬ সালে ইউরোপীয় ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) এক পরিসংখ্যানে আরো দেখা যায়, বাংলাদেশে শতকরা ৪৭ শতাংশ গ্র্যাজুয়েট হয় বেকার, না হয় তিনি যে কর্মে নিযুক্ত, তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। প্রতি বছর বাংলাদেশে ২২ লাখ কর্মক্ষম মানুষ চাকরি বা কাজের বাজারে প্রবেশ করছেন। এই বিশালসংখ্যক কর্মক্ষম মানুষের মাত্র ৭ শতাংশ কাজ পাবেন। এর অর্থ হচ্ছে, দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ বেকারের তালিকায় নাম লেখাচ্ছেন।

বাংলাদেশের এই বেকার তরুণদের যদি আমরা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে মাথায় রেখে আইসিটি সেক্টরে দক্ষ করে তুলতে পারি, তাহলে তারা হয়ে উঠবে একেক জন দেশের সম্পদ। এজন্য এখনই সময় বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মাথায় রেখে কারিকুলাম প্রণয়ন করা। পাবলিক প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় এআই, সাইবার সিকিউরিটি, রোবটিকস ইত্যাদি সাবজেক্ট অন্তর্ভুক্ত করা। বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে আইসিটি সেক্টরে দক্ষ কর্মীর বিকল্প নেই। বেকার তরুণদের চিন্তাচেতনা আর বুদ্ধি যদি কাজে লাগাতে পারে রাষ্ট্র, তবে বাংলাদেশ পরিণত হবে সোনার বাংলায়। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে তরুণ সমাজের বিকল্প নেই।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং গণমাধ্যম

বিশ্বব্যাপী আলোচনার অন্যতম বিষয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)। সিনেমায় বহু দেখা রোবট এখন আমাদের হাতের নাগালে। যেমন, চ্যাটজিপিটিকে প্রশ্ন করলে উত্তর পেয়ে যাচ্ছি। আমাদের প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য এবং লেখার কাজেও সে সহযোগিতা করছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেল সংবাদ উপস্থাপক হিসেবে এআই ব্যবহার করেছে। এর মাধ্যমে বিষয়টি তখন ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। এক্ষেত্রে মূল বিতর্ক ছিল-তাহলে যন্ত্র কি মানুষের জায়গা দ্রুত নিয়ে নেবে?

প্রযুক্তির সঙ্গে গণমাধ্যমের যাত্রা নতুন নয়। হাতে লেখা পত্রিকা থেকে প্রিন্ট পত্রিকা, সেখান থেকে রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেটসহ সব ধরনের প্রযুক্তির সঙ্গেই গণমাধ্যম নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ রেডিও আসায় প্রিন্ট পত্রিকার গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়নি, কিংবা টেলিভিশন আবিষ্কারের কারণে রেডিও ঝরে যায়নি। তবে হ্যাঁ, ব্যবহারে কিছুটা প্রভাব ফেলেছে, এর বেশি কিছু নয়। ঠিক তেমনই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গণমাধ্যমের ক্ষতির কারণ হবে, এমনটা মনে হয় না। কোনও না কোনোভাবে সময়ের সঙ্গে গণমাধ্যমকর্মীরা এআইকে বশ করে ফেলবে নিশ্চিত করেই বলা যায়।

এখন পর্যন্ত শত শত উদাহরণ দেওয়া যাবে, যেখানে গণমাধ্যম সাধারণ মানুষের ফেসবুক ভিডিও কিংবা লাইভ থেকেই ফুটেজ কিংবা তথ্য নিয়ে যাচাই-বাছাই করে সংবাদ সরবরাহ করেছে। অর্থাৎ গণমাধ্যমের সামনে নিত্য-নতুন প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ আসবে, এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে এগিয়ে যাওয়াই বড় কথা। এখন এআই নিয়েও বিশ্বব্যাপী অনেক আলোচনা হচ্ছে। নিউজরুমে যদি এআই একীভূত করা হয়, তাহলে অনেকেই চাকরি হারানোর শঙ্কা করেছেন। এখনো এমনটা মনে

হয় না। বরং এআই ব্যবহার করে কীভাবে গণমাধ্যমকে আরও শক্তিশালী করা যায়- সেদিকেই আমাদের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমা দেশে ইতোমধ্যে অনেকেই এআই ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। সংবাদ সংগ্রহ, সংবাদ তৈরি, তথ্য বিশ্লেষণ, ইমেজ তৈরি, ছবির ক্যাপশন, ভিডিও নির্মাণ, এমনকি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনে এআই ব্যবহার হচ্ছে। বাংলাদেশ বরং এখনও পিছিয়ে আছে। এর প্রধান কারণ ধারণা করা যায় অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা।

অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতেও এআই ভূমিকা রাখতে পারে। যখন কনটেন্ট বাড়বে, তাতে নতুনত্ব আনা যাবে এবং তখন পাঠকও বাড়বে। পাঠক বাড়লে বিজ্ঞাপনদাতারাও নতুন করে ভাবতে উৎসাহী হবেন। এমনকি এআই ব্যবহার করে কীভাবে বিজ্ঞাপন প্রচারেও নতুনত্ব আনা যায়, সেসব নিয়েও কাজ শুরু হয়ে যাবে। অবশ্য এসব কিছুর জন্য প্রশিক্ষণ জরুরি। সাংবাদিকতায় যারা আছেন কিংবা কাজ করতে আগ্রহী, তাদের এই নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। নিউজরুমে কীভাবে এটি একীভূত করা যায়, কীভাবে প্রোডাকশন বাড়ানো যায়, সেসব বিষয়েও কাজ শুরু করতে হবে দ্রুত। তা না হলে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় আমরা পিছিয়ে পড়বো।

ততদিনে দেখা যাবে নতুন কোনও প্রযুক্তি হাজির হয়ে গেছে। তবে এআই ব্যবহারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নতুন এডিটরিয়াল গাইডলাইন তৈরি করা। এআই ইথিক্স কতটা শক্তিশালী হবে, সে বিষয়ে সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞ যারা আছেন, তাদের এখন থেকেই কাজ করতে হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, যন্ত্র কখনও মানুষকে সরিয়ে দিতে পারে না, পারবেও না। বরং মানুষ যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

আমরা জানি সংকট থাকবে, সারা বিশ্বের গণমাধ্যম সংকটে আছে। একইসঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ থাকে। এমন নানামুখী চাপের ভেতরেই সাংবাদিকতা করতে হয়। এটা নতুন নয়। গণমাধ্যমের ইতিহাস দেখলে বোঝা যায়, কেউই খুব সহজভাবে পথ চলতে পারেনি। তবু শেষ পর্যন্ত পাঠকদের জন্যই সাংবাদিকতা করে যেতে হয়। সাংবাদিকতা কোনও চাকরি নয়, এটি সমাজ-দেশ-জাতির প্রতি দায়িত্ব পালন করা।

মানুষের বুদ্ধিমত্তা বনাম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

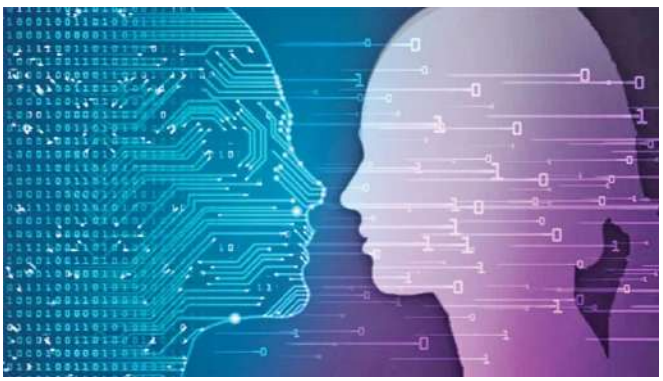

প্রখ্যাত সাহিত্যিক জর্জ আর আর মার্টিন রচিত 'অ্যা সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার'-এর পরবর্তী দু'টি পর্ব রচয়িতার নাম জর্জ আর আর মার্টিন নন। জনৈক ব্যবহারকারী চ্যাটজিপিটির পরিষেবা ব্যবহার করে এ পর্ব দু'টি তৈরি করেছে। নাম দিয়েছে যথাক্রমে 'দ্য উইন্ডস অব উইন্টার' এবং 'অ্যা ড্রিম অব স্প্রিং'। এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার 'প্রোগ্রাম' সহজেই এ কাজটি করেছে। ট্রেনিং হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গ্রহণ করেছে জর্জ মার্টিনের প্রথম পর্বের বইটি। স্বয়ং জর্জ মার্টিন মামলা করেছেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিরুদ্ধে। কেননা তার বইটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ট্রেনিং হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

চ্যাটজিপিটি আর মেধার সৃজনশীলতার লড়াই চলছে আজ সর্বত্র। মানুষ তার জীবনের জন্মমুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি ছোট-বড় ঘটনার সম্মুখীন হয়। প্রতিটি ঘটনাকে সেই মানুষটি তার মস্তিষ্কে ধারণ করে এবং নিজের মতো করে বিশ্লেষণ করে। তার সেই ধারণ থেকে সে লিখতে পাওে কোনো ঘটনার বর্ণনা কিংবা তার আত্মজীবনী। অঙ্ক কষলে দেখা যাবে, মানুষটি কোটি কোটি গিগাবাইট অথবা পেটাবাইট পরিমাণে তথ্য আহরণ করেছে, বিশ্লেষণ করেছে এবং এখনো করে চলেছে। এই একই কাজের জন্য যদি একটি এআই সফটওয়্যার তৈরি এবং চালনার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে সেভাবে ভৌত পরিকাঠামো ও যান্ত্রিক গণনাশক্তিসম্পন্ন যন্ত্র নির্মাণের দরকার হয়। একটি মস্তিষ্কের ধারণ, আর অন্যটি যন্ত্রের ধারণ। একটি মানুষ, আর অন্যটি এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

এআই কিংবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেভাবেই তাকে ডাকা হোক, এর প্রভাব ও প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে- এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এমনকি সমান তালে বাড়ছে তার পরিধি। এআইয়ের দাপট ও প্রভাব এতটাই বেড়েছে এবং ক্রমশ এতটাই ভয়ংকর হয়ে উঠেছে তার তর্জন-গর্জন, মানুষ বেশ অসহায় মনে করতে শুরু করেছে নিজেকে। শিক্ষা, বুদ্ধি, প্রতিভা, জ্ঞান দিয়ে মানুষ যা করতে পারে, এআই তার সবই করতে পারে। বরং মানুষের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি এবং নিখুঁতভাবে তা করতে পারে। কিন্তু মানুষের পক্ষ নিয়ে তর্কে মেতে উঠেছেন সালমান রুশদির মতো অনেকেই।

এআই শুধু বুদ্ধি দিয়ে লিখতে জানে। নিজস্ব রসবোধ, কৌতুকবোধ, জীবনচেতনা- এসব কোথায়? এসব ছাড়া গভীর সাহিত্য কীভাবে লিখবে চ্যাটজিপিটি? চ্যাটজিপিটি তো একটি প্রাণহীন যন্ত্র; তার জীবন অভিজ্ঞতা কোথায়? এআই হয়তো মেনেও নেবে জীবনদর্শনে তার এ দুর্বলতাকে। কিন্তু তারপরও এ বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে কথা থেকেই যায়। কতখানি হইচই পড়েছে- সেই মাপকাঠিতে যদি কোনো জিনিসের গুরুত্ব বিচার করতে হয়, তাহলে বলতে হবে- এ মুহূর্তে এআইর গুরুত্ব অপরিসীম। তবে গুরুত্বের পাশাপাশি সমালোচনার পাহাড়সম বাস্তবতাও আছে।

এআই নিয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। ৪০ বছর বয়সি ওই ব্যক্তি একটি সবজির গুদামে কাজ করত। কাজ চলাকালীনই রোবটের আচমকা আক্রমণে তার মৃত্যু। চলতি বছরে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার রোবটের আঘাতে আক্রান্ত হলো দক্ষিণ কোরিয়ার এই ব্যক্তি। সবজির গুদাম থেকে বাঙে ভরে পাঠিয়ে দেয়ার কাজ করত সে। সবজিভরা বাঙ কনভেয়ার বেল্টে তুলে দিত রোবট। সেই কাজ চলাকালীনই হঠাৎ ওই ব্যক্তিকে সবজির বাঙ ভেবে কনভেয়ার বেল্টে ছুড়ে দেয় রোবট। গুরুতর আহত হয় ওই ব্যক্তি। তার দেহের অন্তত ৫০টি জায়গায় আঘাত লাগে; থেঁতলে যায় তার মুখ ও বুক। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। রোবটের ভুলের খেসারত দিতে হলো ওই ব্যক্তিকে। রোবটের আক্রমণে মৃত্যুর ঘটনা এটাই প্রথম নয় দক্ষিণ কোরিয়ায়। আরেক রোবটের আক্রমণে গুরুতর আহত হয় ৫০ বছর বয়সি এক ব্যক্তি। গুরুতর আহত হলেও ওই ব্যক্তি প্রাণে বেঁচে যায়।

ইতোমধ্যে নেটফ্লিক্সে কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক সিরিজ 'ব্ল্যাক মিরর'-এর একটি পর্ব ছিল 'জায়ান ইজ অফুল'। এর মধ্যে ছিল একটি টিভি শোর কথা, যার গল্পটা লিখেছে কম্পিউটার। আর এতে অভিনয় করেছে কম্পিউটারে তৈরি সালমা হায়েকের প্রতিমূর্তি। অর্থাৎ বিনোদনের ক্ষেত্রেও মানুষকে অপ্রাসঙ্গিক করে দিতে চাইছে এআই প্রযুক্তি। এআই নিয়ে ভয়ে যে ঠাণ্ডা স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে মানব সভ্যতার শিরদাঁড়ায়, সে কথা আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই।

সার্বিকভাবে মানুষের কর্মচ্যুতির ভয়, প্রতিস্থাপিত হওয়ার ভয়,

জীবনের অনেক অংশ এআইর দখলে চলে যাওয়ার ভয়। চ্যাটজিপিটি বাজারে আসার পর তো সভ্যতার ইতিহাসের এক পরিবর্তন-বিন্দু তৈরি হয়েছে। কল্পকাহিনি আর বাস্তব চ্যাটজিপিটির বদৌলতে একাকার হয়ে গিয়েছে। ইতোমধ্যেই হলিউডে চ্যাটজিপিটি নিয়ে চিত্রনাট্যকার আর শিল্পীদের দু'টি বড় মাপের ধর্মঘট হলো।

১৪৮ দিন ধরে চলা প্রথম ধর্মঘটের পরিণতিতে 'রাইটার্স গিল্ড অব আমেরিকা'-এর আপাত জয় হলো। ১১৮ দিন ধরে চলা দ্বিতীয় আন্দোলনের সমাপ্তিতে প্রধান স্টুডিওগুলোর সঙ্গে অভিনেতাদের সংগঠনের সমঝোতা হলো। দু'টি আন্দোলন এবং সমঝোতাই মানবসভ্যতার ইতিহাসের মাইলফলক হয়ে থাকল। সমঝোতা হলো- আপাতত হলিউডে এআইকে লেখক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এভাবেই হলিউডে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অনিবার্য বিজয়রথ ঠেকাতে মরিয়া হয়েছিল মানুষ। তবে এ আপাত সমাধান কি স্থায়ীভাবে ঠেকাতে পারবে এআইর বিজয় প্লাবন? উত্তরটি পেতে আমাদের হয়তো আরো অপেক্ষা করতে হবে। মানুষের প্রগতি অবশ্যই এগোচ্ছে। তবে তা এগোচ্ছে সরলরৈখিক ছন্দে। আর এআই হাঁটছে বিশ্বের অবিশ্বাস্য গতিতে।

মানুষ তাই কীভাবে অনিবার্যতাকে সামলাবে- এ প্রশ্ন আজ সবার মনেই জাগ্রত। অপরিসীম তথ্যমন্থন প্যাটার্ন ম্যাচিংয়ের মাধ্যমে এআইর যে কর্মপদ্ধতি, তার সঙ্গে মানুষের জটিল চিন্তাশৈলীর ব্যাপক পার্থক্য। এটা যেমন সত্য, তেমন সত্য হলো, জীবনযাপনের অনেক ক্ষেত্রেই এআই ম্যাজিক দেখাবে তার উৎকর্ষ এবং উৎপাদনশীলতায়। ২০১১-এর ছবি 'দ্য আইরিশম্যান'-এ রবার্ট ডি নিরোর বয়স কমিয়ে তাকে বিভিন্ন বয়সের দেখানো হয়েছে এআই প্রয়োগ করে। চীনা দুগ্ধ সংস্থা 'মেং নিউ'-এর বিজ্ঞাপনে দৌড়াতে দেখা গেল ফরাসি ফুটবলার এমবাপেকে। আসলে দৌড়িয়েছেন অন্য এক মানুষ এবং ব্যবহৃত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্মিত ডিজিটাল মুখোশ। এতকিছুর পর তবুও কথা থেকেই যায়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি প্রতিস্থাপন করতে পারে কোন লেখকের গল্প? লেখকের এ চ্যালেঞ্জের পর চ্যাটজিপিটির কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তা গ্রহণ করে ৪৩ বছর আগের রুশদির গদ্য-স্টাইল নকল করে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে লিখে ফেলল ২০০ শব্দের কয়েকটি প্যারা।

সেই লেখা পড়ে রুশদি বললেন, 'অ্যা বাঞ্চ অব ননসেন্স।' কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সমর্থকরা জানতে চাইলেন, লেখা একগুচ্ছ অর্থহীন বাক্যমাত্র কেন? রুশদির উত্তর, শুধু বুদ্ধি দিয়ে কী হবে? নিজস্ব রসবোধ, কৌতুকবোধ, জীবনচেতনা- এসব কোথায়? এসব ছাড়া গভীর সাহিত্য লেখা যায় না। আর চ্যাটজিপিটির এগুলো নেই। কেবল সালমান রুশদিই নন, অনেকে তাই প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন এআইর সফলতার মুখে। চ্যাটজিপিটি কি একজন লেখকের আবেগকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে? পারে কি শাহরুখ খানের ম্যাজিক অভিনয়কে? লেখা কিংবা অভিনয়ের ক্ষেত্রে মানুষের আবেগ এবং অভিজ্ঞতার জটিলতাই তো কেন্দ্রীয় বিষয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি এই মানবিক অনুভূতির সূক্ষ্মতার তারটির নাগাল পাবে কোনোদিন? এক গভীর মানসিক পরিমণ্ডলে দর্শককে আষ্টেপৃষ্ঠে আবিষ্ট করার ক্ষমতা কি আদৌ আছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংবলিত রোবটের? কিন্তু কথা তো সেখানেই শেষ হয়ে যায় না।

১৯৯৭ সালের ১১ মার্চ সভ্যতার ইতিহাসের এক অমোঘ পরিবর্তন বিন্দুতে আইবিএমের দাবা খেলার কম্পিউটার হারিয়ে দিয়েছিল কিংবদন্তি দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভকে। যন্ত্রের বুদ্ধিমত্তার কাছে মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরাভবে শিউরে উঠেছিল সেদিন মানুষ। পৃথিবীর মানুষ আজ যেন এক জটিল সময়কালে, সভ্যতার এক ভয়ংকর আবর্তে দাঁড়িয়ে। মানুষের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংঘাত, না মিলন- এ ভাবনায় দিন কাটছে পৃথিবীর মানুষের। বোতলমুক্ত প্রযুক্তির দৈত্যকে আবার বোতলবন্দি করা আর সম্ভব নয়। তাকে হারানোও মানুষের পক্ষে কঠিন। সুচিন্তিত আর সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে সেই এআইকে আমাদের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার কথা কি ভাবা যায়? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে।

কর্মসংস্থানের কোনো বিকল্প নেই

চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের ফলে বদলে যাচ্ছে চাকরির ধরন। হারিয়ে যাচ্ছে পুরোনো পেশা এবং তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন কাজের ক্ষেত্র। এর ফলে সারা বিশ্বে চাকরির বাজারে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটে চলেছে। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বিশ্বের ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষ চাকরি হারাবে। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের পরিবর্তে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাজ চালাবে বলে এই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এআই হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রযুক্তি। মানুষের মস্তিষ্কের মতো চিন্তা-ভাবনা, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাকায় এআই দিয়ে সহজেই করা যাচ্ছে প্রাত্যহিক জীবনের অনেক কাজ। বর্তমানে বেশিরভাগ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানই এআইর ব্যবহার করছে এবং অন্যান্য খাতের প্রতিষ্ঠানেও এর ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। ভবিষ্যতে শিল্পক্ষেত্রে বেশিরভাগ কাজই সম্পন্ন হবে এআইর মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মতে, বেশিরভাগ শিল্প খাতেই আংশিকভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা সম্ভব হবে। সে ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের পরিপূরক হিসেবেই কাজ করবে, তবে মানুষের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া সম্ভব হবে না।

চ্যাটজিপিটি, মাইক্রোসফট বিং, গুগল বার্ডের মতো এআই টুল মানুষের জীবনকে আরও সহজ এবং গতিশীল করেছে। এআই যেমন বর্তমান চাকরির বাজারের জন্য এক আসন্ন বিপদ, তেমন ভবিষ্যৎ চাকরির জন্য এক বিশাল সম্ভাবনা। এআইর ফলে প্রায় ১০ ধরনের চাকরি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এর মধ্যে রয়েছে কন্টেন্ট তৈরির কাজের মতো সৃজনশীল পেশাও। বিভিন্ন এআই টুলের সহায়তায় এখন অতি সহজে এবং স্বল্প সময়েই তৈরি করা যাচ্ছে বিভিন্ন ডিজাইন ও ভিডিও বানানোর কাজ। এ ছাড়া ব্যাংকার, ট্যাক্সি ড্রাইভার, ট্রান্সলেটর, ক্যাশিয়ারের মতো কাজ অচিরেই হারিয়ে যেতে পারে।

নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও এআইর বিরাট ভূমিকা

এআই কেবল চাকরি কেড়েই নেবে না, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও এআইর রয়েছে বিরাট ভূমিকা। যেসব নতুন কর্মসংস্থান এআই তৈরি

করবে তার মধ্যে রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ার, মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার অন্যতম। এ ছাড়াও নিত্য নতুন গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায় গবেষক, বিজ্ঞানীদের চাহিদা বাড়বে। ডাটা বিশ্লেষক, ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন স্পেশালিস্ট ও সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ বেড়ে যাবে এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে। ওয়ার্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২৭ সালের মধ্যে এআই ও মেশিন লার্নিং বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ৪০ শতাংশ বেড়ে যেতে পারে; ডাটা-বিশ্লেষক, বিজ্ঞানী বা বিগ ডাটা অ্যানালিস্টের সংখ্যা বাড়বে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ এবং ইরফরমেশন সিকিউরিটি অ্যানালিস্টের সংখ্যা ৩১ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে।

অন্যান্য দেশের মতো চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব বাংলাদেশেও পড়া শুরু হয়েছে। ২০২৩ সালে এটুআইর উদ্যোগে ১৬টি সেক্টরের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের ওপর একটি গবেষণা পরিচালিত হয়। সেক্টরগুলো হলো-রেডিমেড গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল, ফার্নিচার, এগ্রো-ফুড, লেদার, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি, সিরামিক, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, হেলথ কেয়ার, আইসিটি, কনস্ট্রাকশন, রিয়েল এস্টেট, ট্রান্সপোর্টেশন, ফার্মাসিউটিক্যাল, ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ক্রিয়েটিভ মিডিয়া এবং ইনফরমাল ও সিএমএসএমই।

ফলাফলে দেখা যায়, ২০৪১ সাল নাগাদ এসব সেক্টরের বিভিন্ন পেশায় কর্মরত ৭০ লক্ষাধিক লোক চাকরি হারাবে, আবার নতুন নতুন পেশায় ১ কোটি ১০ লক্ষাধিক চাকরির বিশাল সুযোগ তৈরি হবে। ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় উল্লেখযোগ্য পেশাগুলো হলো-এআই স্পেশালিস্ট, ব্লকচেইন এক্সপার্ট, থ্রি ডি ডিজাইনার, কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স ম্যানেজার, এআর অ্যান্ড ভিআর ডেভেলপার, অকোনোমাস ভেহিক্যাল টেকনিশিয়ান, ড্রোন সার্ভেয়ার, সাইবার ফিজিক্যাল কন্ট্রোল সিস্টেম অপারেটর ও রোবট ডক্টর ভার্চুয়াল হোম অ্যাসিসট্যান্ট। নতুন এই বাজার চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বেকার যুবদের জন্য নানারকম দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু করেছে।

২০১৯ সালেও ৫টি সেক্টরের (এগ্রো-ফুড, ফার্নিচার, রেডিমেড গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি এবং লেদার) ওপর এটুআই কর্তৃক অনুরূপ গবেষণা পরিচালিত হয়। সে গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, রেডিমেড গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল সেক্টরে বিদ্যমান পেশার ৬০ শতাংশ, ফার্নিচার সেক্টরে ৬০ শতাংশ, এগ্রো-ফুড সেক্টরে ৪০ শতাংশ, লেদার সেক্টরে ৩৫ শতাংশ এবং ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি সেক্টরের ২০ শতাংশ পেশা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে যেসব পেশা, তা হলো-গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল সেক্টরের ম্যানুয়াল সুইং মেশিন অপারেটর ও ফ্যাব্রিক কাটার, ফার্নিচার সেক্টরের ফার্নিচার ডিজাইনার ও ম্যানুয়াল অপারেটর, এগ্রো-ফুড সেক্টরের ম্যানুয়াল ফুড সর্টার ও প্যাকেজিং অপারেটর; লেদার সেক্টরের লেদার কাটার ও লেদার পলিশার এবং ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি সেক্টরের ট্যুর গাইড ও ট্র্যানশ্লেটর। ইতিমধ্যে এসব পেশায় কর্মরতদের চাকরি চলে যাওয়া শুরু হয়েছে, যাদের রিস্কিলিং (বিদ্যমান পেশা থেকে নবসৃষ্ট পেশায় স্থানান্তর) ও আপস্কিলিং (চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যমান পেশার উন্নয়ন) করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে প্রতি বছর ২২ লক্ষাধিক যুব শ্রমবাজারে আসে। চাকরির বাজার প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল হওয়ার কারণে বিশাল এই যুব জনগোষ্ঠীকে চাকরির বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে নানারকম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। এর অন্যতম কারণ হলো, ৯৫ শতাংশ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার কোচ বা পরামর্শদাতা নেই, ৫৬ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মজীবন সম্পর্কিত সহায়ক কোনো সেবা নেই এবং ৯৪ শতাংশ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান সম্পর্কিত কোনো কার্যক্রম নেই।

বাংলাদেশে ৫০টির বেশি সরকারি বেসরকারি ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেন্টার থাকলেও তাদের মধ্যে তেমন কোনো সমন্বয় নেই। প্রতি বছর শ্রমবাজারে আসা বিশাল এ জনগোষ্ঠীকে ভবিষ্যৎ কর্মোপযোগী 'স্মার্ট নাগরিক' হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি এ ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেন্টারগুলোকে নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে 'স্মার্ট ক্যারিয়ার গাইডেন্স নেটওয়ার্ক'।

বর্তমানে বাংলাদেশে যুব বেকারত্বের হার ১০.৬ শতাংশ ও শিক্ষিত বেকারত্বের হার ৪৭ শতাংশ। পাশাপাশি শিক্ষা-দক্ষতা-কর্মসংস্থানের বাইরে রয়েছে (এনইইটি- নট ইন এডুকেশন, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং) প্রায় ১ কোটি ১৬ লাখ যুব। 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট ২০১৯ : টারশিয়ারি এডুকেশন অ্যান্ড জব স্কিল' শীর্ষক বিশ্ব ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, স্নাতক শেষ করার পর ৩৭ শতাংশ তরুণ ও ৪৩ শতাংশ তরুণীর চাকরি পেতে ন্যূনতম এক-দুই বছর সময় লাগে এবং মাত্র ১৯ শতাংশ তরুণ-তরুণী স্নাতক পাসের পরপরই পূর্ণকালীন বা খণ্ডকালীন চাকরি পেয়ে থাকেন।

সাপ্লাই, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান ও ডিমান্ডের শিল্প-প্রতিষ্ঠান এর মধ্যে ভার্চুয়ালি সমন্বয় সাধন করে বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এটুআই কর্তৃক ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স ফর স্কিলস, এডুকেশন, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড অন্ট্রাপ্রেনারশিপ (নাইস) তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে নাইসে ১০ লক্ষাধিক বেকার যুব, সহস্রাধিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান, ২ হাজারেরও অধিক কোম্পানি নিবন্ধিত রয়েছে। চাকরির বাজার সম্পর্কিত তথ্য ও আবেদন, ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেবা, দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য ও আবেদনসহ বেকার যুবদের জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ সেবা রয়েছে এ প্ল্যাটফর্মে। একজন বেকার যুব এ প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদফতরের দক্ষতা উন্নয়নমূলক অকুপেশন, পেশায় ভর্তির আবেদন করতে পারে কিংবা বিভিন্ন কোম্পানির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী চাকরিতে আবেদন করতে পারে।

পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা দেখে তাদের নতুন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারছে। আবার শিল্প প্রতিষ্ঠান আবার তার চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ লোক এ প্ল্যাটফর্ম থেকে বাছাই করে নিতে পারছে। এ ভাবে নাইস বেকার যুবদের কাছে হয়ে উঠছে দক্ষতা ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত 'ওয়ান স্টপ হাব'। নাইস প্ল্যাটফর্ম দেশের সীমানা পেরিয়ে দেশের বাইরেও বেকার সমস্যা সমাধানে কাজ করছে। এটুআইর সহযোগিতায় সোমালিয়া ও জর্ডান সরকার এ প্ল্যাটফর্মটিকে তাদের নিজ নিজ দেশের জন্য ব্যবহার করছে। আফ্রিকার দেশ সাও তোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপ ও ঘানা এ প্ল্যাটফর্মটিকে তাদের দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে ব্যবহার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগীসহ সবাইকে কাজ করা প্রয়োজন একসঙ্গে, একযোগে ও একলক্ষ্যে।

হীরেন পণ্ডিত: প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট ও রিসার্চ ফেলো
ফিডব্যাক: *hiren.bnnrc@gmail.com*
ছবি: ইন্টারনেট

ফ্রিল্যান্সিং এক উদীয়মান ও প্রতিশ্রুতিশীল পেশা

হীরেন পণ্ডিত

অনলাইন শ্রমবাজার বা ফ্রিল্যান্সিং খাতে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। মোট অনলাইন শ্রমবাজার বাংলাদেশের অংশ প্রায় ১৬ শতাংশ। গত এক বছরে দেশে ই-কমার্স খাতেও প্রায় এক লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ৭ লাখ মানুষ ফ্রিল্যান্সিংয়ের সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে বসে বিশ্বের উন্নত দেশের কাজ করতে শুরু করে। তবে বিদেশ থেকে টাকা আনা নিয়ে হাজারও ঝক্কি পোহাতে হয়, যেগুলো এখন অনেকটাই ঠিক হয়ে এসেছে। কিন্তু এগুলো আরও ১০ বছর আগেই ঠিক হয়ে যেতে পারত। শুধু নীতিগত কারণে পিছিয়ে যাওয়া। বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সিং ক্ষেত্রে বেশ ভালো একটি জায়গা করে নিয়েছে। এ কাজটিতে বাংলাদেশ আরও ভালো করতে পারত, যদি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেটের ভালো গতি পৌঁছে দেয়া যতো এবং ডিজিটাল পেমেন্টাকে সহজতর করা যেতো।

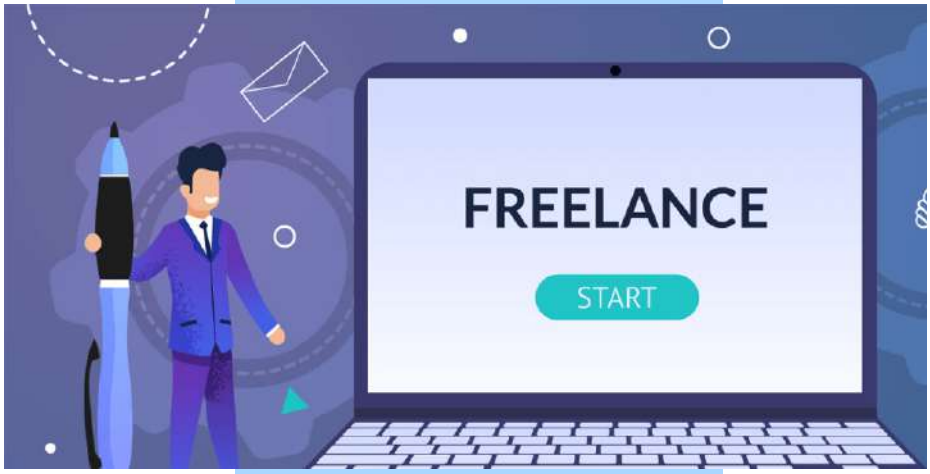

এ দশকেও বাংলাদেশ তার ইন্টারেনেটের গতি ঠিক করতে পারেনি। বাংলাদেশের মানুষ দুই উপায়ে ইন্টারনেট পেয়ে থাকে। একটি হলো ফাইবার অপটিক ব্রডব্যান্ড, আরেকটি হলো মোবাইল ইন্টারনেট। বাংলাদেশে পরিকল্পিত উপায়ে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠেনি। ঢাকার চেয়ে জেলা শহরগুলোতে ইন্টারনেটের গতি কম। সরকারের ঘোষিত এক দেশ এক রেট এর সফল বাস্তবায়ন। বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত এখনো ঢাকাকেন্দ্রিক। ঢাকায় কিছু কিছু এলাকা ফাইবারের আওতায় এসেছে। কিন্তু সেগুলো আন্তর্জাতিক মানের করতে হবে।

আর মোবাইল ইন্টারনেটের অবস্থা এখনো খারাপ, সেটি তো আমরা সবাই জানি। ঢাকা শহরের মানুষ কিছুটা গতি পেলেও ঢাকার বাইরের অবস্থা খুবই নাজুক। এটি মূলত হয়েছে মোবাইল অপারেটররা ঢাকার বাইরে তেমন বিনিয়োগ করেনি, বাংলাদেশের মানুষ জেলা শহরেই অনেক সময় ভালো নেটওয়ার্ক পায় না। তথ্যপ্রযুক্তি খাত প্রাইভেট সেক্টরে প্রসারিত হওয়ার জন্য যেই অবকাঠামোর প্রয়োজন ছিল, তা এখনো তৈরি হয়নি।

তথ্যপ্রযুক্তি হলো এমন একটি খাত, যেখানে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। এর জন্য চাই প্রকৃত বুদ্ধিমান মানুষ। কিন্তু বাংলাদেশ এখন বড় ধরনের 'ব্রেইন-ড্রেইন'-এর ভেতর পড়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশ থেকে সরাসরি ভালো দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে যাচ্ছে। ফলে, সেবা তৈরি করার মতো মানুষ এ দেশে থাকছে না। আমরা মূলত কনজ্যুমার হচ্ছি। আমাদের যদি প্রস্তুতকারকের ভূমিকায় আসতে হয়, তাহলে আরও বুদ্ধি লাগবে। আর তৃতীয়টি হলো ইন্টিলেকচুয়াল কপিরাইট প্রটেকশন, যা বাংলাদেশে এখনো বেশ দুর্বল। মেধাস্বত্ব যদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা না যায়, তাহলে মেধাবীরা এখানে থাকবে না। আর এ শিল্পে মেধার কোনো বিকল্প নেই।

দেশে ইন্টারনেট প্রাপ্তি সহজ হওয়ায় ডিজিটাল অর্থনীতি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। গত এক বছরে দেশে ইকমার্স খাতে প্রায় এক লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। আগামী এক বছরে আরও পাঁচ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। ভারতের পর বর্তমানে অনলাইন কর্মসংস্থানে বাংলাদেশের অবস্থান এবং বিশ্বে দ্বিতীয়। করোনার কারণে যারা চাকরি হারিয়েছিলেন, তাদের অনেকেই উদ্যোক্তা হিসাবে ই-কমার্সে প্রবেশ করেছেন।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রধান হাতিয়ার তথ্যপ্রযুক্তি। এখন যারা বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি পরিবহণ সুবিধা দিচ্ছে, তাদের নিজস্ব কোনো যানবাহন নেই। যারা সবচেয়ে বড় হোটেল নেটওয়ার্ক সুবিধা দিচ্ছে, তাদের নিজস্ব কোনো হোটেল নেই। প্রতিদিন নিত্যনতুন প্ল্যাটফরম তৈরি হচ্ছে। নতুন নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে। একই অবস্থা বাংলাদেশেও। দিনে দিনে অনলাইন লেনদেনও ব্যাপক বেড়েছে। দেশের বর্তমানে প্রায় ৫ কোটি মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করছে। এ খাতেও বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। ফেসবুককেন্দ্রিক উদ্যোক্তা ৫০ হাজার, ওয়েবসাইটভিত্তিক উদ্যোক্তার সংখ্যা দুই হাজার। দেশে এখন ক্রিয়েটিভ ও মালটিমিডিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন ১৯ হাজার ৫৫২ জন।

এ খাতে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যে ডিজিটাল প্ল্যাটফরমগুলো তৈরি হচ্ছে, তার জন্য রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক আছে কিনা; এখাতের জন্য ইনসেনটিভ আছে কি না; নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য কোনো রাজস্ব ছাড় আছে কি না; এরা করজালে আসছেন কি না-তা দেখতে হবে। এটাকে এটা সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। ই-কমার্স একটি উদীয়মান খাত। এ খাতে শুধু ভোক্তার স্বার্থই নয়, উদ্যোক্তার সুবিধা নিশ্চিতেও একটি নীতিমালা অপরিহার্য। এ ছাড়া এলডিসি উত্তরণে ডিজিটাল প্ল্যাটফরম ইকোনমি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য বিদ্যমান বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সম্মিলিতিভাবে কাজ করতে হবে।'

আর উদ্যোক্তাদের জন্য চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে-ডিজিটাল ডিভাইসের অভাব। দেশে

গরিব জনসংখ্যার প্রতি এক হাজার জনের মধ্যে চারজনের কম্পিউটার রয়েছে। এ ছাড়া, নীতি সহায়তার অভাব, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধার অভাব, ইন্টারনেটের ধীর গতি, বিনিয়োগ, ইংরেজি ভাষার দক্ষতার অভাব, কারিগরি জ্ঞানের অভাব। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবিলা করতে হলে দক্ষ জনবল তৈরি করতে হবে। প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে আরও সহজভাবে সেবা দিতে হবে। একই সঙ্গে একটি জাতীয় নীতিমালাও তৈরি করতে হবে। এ খাতকে এগিয়ে নিতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কর অব্যাহতি দিতে হবে।

বিদেশি বিভিন্ন প্ল্যাটফরমে কাজ করে আয় করায় উৎসাহ বাড়াতে ফ্রিল্যান্সারদের প্রাথমিকভাবে ৫৫টি স্বীকৃত প্ল্যাটফরম নির্ধারণ করে দিয়েছে সরকার। এসব অনলাইন মার্কেটপ্লেসে কাজ করে আয় করলে চলতি ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ৪ শতাংশ নগদ প্রণোদনা পাচ্ছেন ফ্রিল্যান্সাররা। বাংলাদেশ ব্যাংক এক সার্কুলারে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ স্বীকৃত এসব মার্কেটপ্লেসের তালিকা প্রকাশ করে। ব্যক্তি পর্যায়ের ফ্রিল্যান্সাররা সফটওয়্যার ও আইটিইএস সেবা অনলাইন মার্কেটপ্লেসের মাধ্যমে রপ্তানি করে থাকে। সফটওয়্যার ও আইটিইএস সেবা রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা পেতে হলে সংশ্লিষ্ট অনলাইন মার্কেটপ্লেসকে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ার শর্ত রয়েছে।

মার্কেটপ্লেসের ওই তালিকায় নাম রয়েছে- আপওয়ার্ক, ফাইভার, ফ্রিল্যান্সার ডটকম, গুরু, পিপল পার আওয়ার, টপটাল, ফ্লেজ্জব, ৯৯ ডিজাইনস, সিমপি হায়ার্ড, অ্যাকুয়েন্ট, পাবলফট, ডিজাইনহিল, বার্ক, গোলেন্স, ফ্রিআপ, হাবস্টাফ ট্যালেন্ট, সলিড গিগস, উই ওয়ার্ক রিমোটলি, গিগস্টার, ড্রিববল, বিহেন্স, ক্লাউডপিপস, এনভাটো, হ্যাকারন, আমাজান মেকানিকাল টার্ক, শাটারস্টক, অ্যাডোবি স্টক, আই স্টক, ডিপোজিট ফটোসস, ১২৩ আরএফ, পন্ড৫, ড্রিমসটাইম, ক্রিয়েটিভ মার্কেট, ক্যানস্টকফটো, অ্যালামি, ইউনিটি অ্যাসেট স্টোর, স্কেচফ্যাব, ফ্রিপিক, অ্যাউইন, শেয়ারঅ্যাসেল, ফ্লেজঅফারস, ম্যাজ্বাউন্টি, ট্রেডডাবলার, সিজে অ্যাফিলিয়েট, ভিগলিংক, জেভিজু, রাকুটেন, ক্লিকব্যাংক, আমাজন অ্যাসোসিয়েটস, ওয়ালমার্ট অ্যাফিলিয়েট, গুগল অ্যাডসেন্স, ফেসবুক মনিটাইজেশন, ইউটিউব মনিটাইজেশন, অ্যাপস্টোর ও প্লেস্টোর।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের নির্বাহী চেয়ারম্যান ক্লাউস শোয়াব ২০১৫ সালে ফরেন অ্যাফেয়ার্সে প্রকাশিত একটি নিবন্ধের মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব শব্দটিকে বৃহৎ পরিসরে সামনে নিয়ে আসেন। শোয়াব তখন এমন সব প্রযুক্তির কথা উল্লেখ করেন, যার মাধ্যমে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও বায়োলজিকে (সাইবার-ফিজিক্যাল সিস্টেমস) একত্র করে পৃথিবীকে উন্নতির পথে আরো গতিশীল করা যায়। শোয়াব মনে করেন, যুগটি রোবোটিক্স বুদ্ধিমত্তা, ন্যানোটেকনোলজি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, বায়োটেকনোলজি, ইন্টারনেট অব থিংস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারনেট অব থিংস, ডিসেন্ট্রালাইজড কনসেনসাস, পঞ্চম প্রজন্মের ওয়্যারলেস প্রযুক্তি, থ্রিডি প্রিন্টিং ও সম্পূর্ণ ড্রাইভারবিহীন গাড়ি উদীয়মান প্রযুক্তির যুগান্তকারী যুগ হিসেবে চিহ্নিত হবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চতুর্থ শিল্প বিপ্লব; যার গতির দৌড় কল্পনার চেয়েও বেশি। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবটির ভিত হচ্ছে 'জ্ঞান ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' ভিত্তিক কম্পিউটিং প্রযুক্তি। রোবটিক্স, আইওটি, ন্যানো প্রযুক্তি, ডাটা সায়েন্স ইত্যাদি প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে নিয়ে যাচ্ছে অনন্য উচ্চতায়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে কর্মবাজারে। অটোমেশন প্রযুক্তির ফলে ক্রমে শিল্প-কারখানা হয়ে পড়বে যন্ত্রনির্ভর। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফক্সকন এরই মধ্যে হাজার হাজার কর্মী ছাঁটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে বিপুল পরিমাণ মানুষ চাকরি হারালেও এর বিপরীতে সৃষ্টি হবে নতুন ধারার নানা কর্মক্ষেত্র। নতুন যুগের এসব চাকরির জন্য প্রয়োজন উঁচু স্তরের কারিগরি দক্ষতা। ডাটা সায়েন্টিস্ট, আইওটি এক্সপার্ট, রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ারের মতো আগামী দিনের চাকরিগুলোর জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী তরুণ জনগোষ্ঠী। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা অনুযায়ী, আগামী দুই দশকের মধ্যে মানবজাতির ৪৭ শতাংশ কাজ স্বয়ংক্রিয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে শ্রমনির্ভর এবং অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতানির্ভর চাকরি বিলুপ্ত হলেও উচ্চ দক্ষতানির্ভর যে নতুন কর্মবাজার সৃষ্টি হবে, সে বিষয়ে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে তার জন্য প্রস্তুত করে তোলার এখনই সেরা সময়। দক্ষ জনশক্তি প্রস্তুত করা সম্ভব হলে জনমিতিক লভ্যাংশকে কাজে লাগিয়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল ভোগ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অন্য অনেক দেশ থেকে অনেক বেশি উপযুক্ত।

এক্ষেত্রে আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হতে পারে জাপান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভঙ্গুর অর্থনীতি থেকে আজকের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ জাপান পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছে শুধু মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক ও সার্বিক জীবনমানের উত্তরণ ঘটানো যায়। জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ অত্যন্ত নগণ্য এবং আবাদযোগ্য কৃষিজমির পরিমাণ মাত্র ১৫ শতাংশ।

জাপান তার সব প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা অতিক্রম করেছে জনসংখ্যাকে সুদক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার মাধ্যমে। জাপানের এ উদাহরণ আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। বাংলাদেশের সুবিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে পারলে আমাদের পক্ষেও উন্নত অর্থনীতির একটি দেশে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়।

শিল্প-কারখানায় কী ধরনের জ্ঞান ও দক্ষতা লাগবে, সে বিষয়ে আমাদের শিক্ষাক্রমের তেমন সমন্বয় নেই। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় শিক্ষা ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজাতে হবে। সারা দেশে সাশ্রয়ী মূল্যে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করতে

হবে। সরকারি-বেসরকারি অফিসের ফাইল-নথি পত্র ডিজিটাল ডকুমেন্টে রূপান্তর করতে হবে। আর নতুন ডকুমেন্টও ডিজিটাল পদ্ধতিতে তৈরি করে সংরক্ষণ ও বিতরণ করতে হবে।

এ বিষয়ে বর্তমানে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে, তবে সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তাব এখনো অনেকটা অনুপস্থিত মনে হয়। কেবল পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের মানবসম্পদকেও যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে হবে এ পরিবর্তনের জন্য। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আইওটি, ব্লকচেইন এসব প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ এখনো অনেক পিছিয়ে। এসব প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, পণ্য সরবরাহ, চিকিৎসা, শিল্প-কারখানা, ব্যাংকিং, কৃষি, শিক্ষাসহ নানা ক্ষেত্রে কাজ করার পরিধি এখনো তাই ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত।

সরকার ও সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বেসিস চাইছে, এই ফ্রিল্যান্সাররা এখন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠুক। এতে কর্মসংস্থান বাড়বে, আরও নতুন ফ্রিল্যান্সার আসবে। ফ্রিল্যান্সিংকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিলে তা তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। সরকার স্টার্টআপদের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। ব্যাংকও এ খাতে কাজ করছে। অর্থাৎ বাজার তৈরি রয়েছে। বেসিস থেকে ফ্রিল্যান্সারদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ফ্রিল্যান্সিংকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ জন্য সুবিধাও ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন ব্যাংক এশিয়া থেকে ফ্রিল্যান্সারদের সুবিধা দিতে বেসিসের সঙ্গে মিলে স্বাধীন নামে প্রি-পেইড কার্ড চালু করা হয়েছে। এ কার্ডের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সাররা বিদেশ থেকে দেশে লেনদেন করতে পারছেন।

ফ্রিল্যান্সিংয়ের জন্য জনপ্রিয় মার্কেটপ্লেস। এসব কাজে পুরুষদের আয় যেখানে ঘণ্টায় ২১.৫৭ পাউন্ড, সেখানে নারীদের আয় ২২.৪৩ পাউন্ড। তবে এসব বৈদেশিক অর্থ দেশে আনতে বাংলাদেশের সঙ্গে পেপ্যালের কোনো চুক্তি না থাকায় অতিরিক্ত কমিশন খরচসহ রয়েছে নানা ভোগান্তি। আবার প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতার অভাবে বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সারদের পারিশ্রমিকও কম। বিশ্বায়নের ফলে আজ ছোট্ট একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে পুরো বিশ্ব প্রযুক্তির কল্যাণে। ফ্রিল্যান্সিংয়ের মতো বৈদাশিক মুদ্রা আয় ও কর্মসংস্থান তৈরির নতুন উৎস খুঁজে পেয়েছে বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষিত বেকার সমাজ। ঘরে বসেই হুন্দাই ও মার্সিডিজের মতো বিশ্বখ্যাত ব্যান্ডের গাড়ির থ্রি-ডি নকশা প্রস্তুত করছেন বাংলাদেশী ফ্রিল্যান্সাররা। জনপ্রিয় ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেস ফাইভারের তথ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ও ভারতের পরেই সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশী ফ্রিল্যান্সারদের অবস্থান।

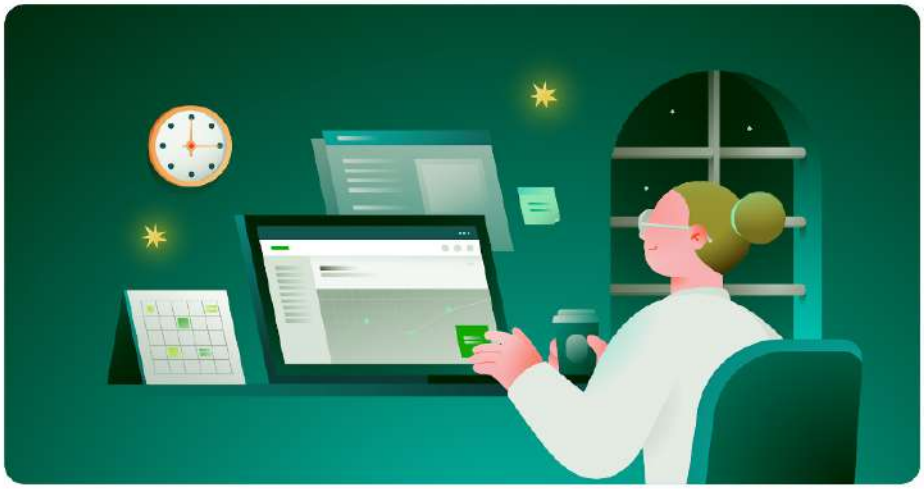

ফাইবার, ফ্রিল্যান্সিং ডটকম, আপওয়ার্ক ইত্যাদি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিংয়ের জন্য জনপ্রিয় মার্কেটপ্লেস। এগুলোতে রয়েছে ডাটা এন্ট্রি, কনটেন্ট রাইটিং, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, এফিলিয়েট মার্কেটিং, এসইও, ওয়েব ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক ডিজাইন ইত্যাদি ফ্রিল্যান্সিং কাজ। আইসিটি বিভাগের ২০২৩ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রায় ৬ লাখ ৫০ হাজারের অধিক ফ্রিল্যান্সার রয়েছে, যাদের মধ্যে ৫ লাখ ফ্রিল্যান্সার নিয়মিত কাজ করছে।

তাদের বার্ষিক আয় প্রায় ১০০ কোটি ডলার বা ১০ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। সারাবিশ্বে ১৫৭ কোটি মানুষ ফ্রিল্যান্সিংয়ের সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে বিশ্বের টপ রেটেড ফ্রিল্যান্সারদের ৬৪ শতাংশই বাংলাদেশী। সংখ্যা বিবেচনায় বৈশ্বিক ফ্রিল্যান্সারের ২৪ শতাংশ নিয়ে ভারত শীর্ষে, ১৬ শতাংশ নিয়ে বাংলাদেশ দ্বিতীয় এবং ১২ শতাংশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় অবস্থানে আছে। তবে আয়ের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের অবস্থান অষ্টম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় তৃতীয়। বেকারত্ব বাংলাদেশের জন্য একটি উদ্বেগজনক বিষয়। বিবিএসের তথ্য অনুসারে দেশে বর্তমানে প্রায় ২ কোটির বেশি তরুণ ও যুব সমাজ রয়েছে। যাদের মধ্যে শিক্ষিত বেকার আছে ২৫ লাখ। বেকারদের মধ্যে ১৬ লাখ ৭০ হাজার পুরুষ আর আট লাখ ৩০ হাজার নারী। মোট বেকারের ১২ শতাংশ উচ্চ শিক্ষিত। যাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, তাদেও বেকারত্বের হার মাত্র ১.০৭ শতাংশ।

উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা বেকারের হার ৮.৭৮ শতাংশ এবং মাধ্যমিক উত্তীর্ণ বেকার ২.৪২ শতাংশ। বিআইডিএসের গবেষণার মতে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করা ৬৬ শতাংশই বেকার থাকছে। লন্ডনের ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের হিসাবে, বাংলাদেশে ১০০জন স্নাতকের মধ্যে ৪৭ জনই বেকার। অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ এবং সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের সমীক্ষা মতে, বৈষম্য আর গুণগত শিক্ষার অভাবে ৭৮ শতাংশ তরুণ পড়াশোনা করে চাকরি পায় না। গরিব পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে এই হার ৯০ শতাংশ। দেশে মোট জনশক্তির পরিমাণ কমবেশি ৭ কোটি ৩০ লাখ ৫০ হাজার। জনশক্তির এই অনুপাতে চাকরির বাজার খুবই সীমিত। সরকার নিশ্চয়ই ঘরে ঘরে চাকরি দিতে পারবে না। তবে ঘরে ঘরে ফ্রিল্যান্সার তৈরি করতে পারবে। তাই এই মুক্ত পেশাকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনীতিকে খুব ভালো অবস্থানে পৌঁছানো সম্ভব। সেজন্য প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ এবং পৃষ্ঠপোষকতা।

বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে, এমনকি যেখানে ইন্টারনেট আছে, সেরকম উপজেলা পর্যায়েও অনেকে ব্যক্তি উদ্যোগে ফ্রিল্যান্সিং করছে। কিন্তু সেটা পুরোপুরি কাঠামোগতভাবে হচ্ছে না। এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ফ্রিল্যান্সারদের আরও প্রশিক্ষণ ও যথার্থ তত্ত্বাবধান করা দরকার। যাতে ফ্রিল্যান্সাররা ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসসহ বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার সহজ ও নির্ভরযোগ্য পরিবেশ পায়।

ইতোমধ্যেই নিজ উদ্যোগে ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে দেশের লাখ লাখ তরুণ-তরুণী সামান্য আইসিটি প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মক্ষম হয়ে বিপুল

বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছে। চাকরির পেছনে সময় নষ্ট না করে ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে বেকারত্বের মতো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করছে। দেশকে অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ করছে। কোনোরকম সরকারি পৃষ্ঠপোষক ছাড়া তারা ২০০৮ সালে প্রথম ফ্রিল্যান্সিং যুগে প্রবেশ করে।

তখন মাত্র ৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল- যা এখন বেড়ে ৬০০ মিলিয়নে পৌঁছেছে ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী। ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ এ খাতে ২ থেকে ৩ বিলিয়ন ডলার আয় করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিদেশ থেকে অর্থ আনার প্ল্যাটফর্ম এবং যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক নিশ্চিত হলে এ আয় আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

সময়টা এখন তথ্যপ্রযুক্তির এবং এর কল্যাণে বিশ্ব চলে এসেছে হাতের মুঠোয়। এখন ঘরে বসে যেমনি সারাবিশ্বের খোঁজ-খবর রাখা যায়, ঠিক তেমনি ঘরটাও হতে পারে ফ্রিল্যান্সিংয়ের জন্য উপযুক্ত কর্মস্থল। এসব কাজে সরকারও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। নিয়েছে নানা প্রশংসনীয় উদ্যোগ। দেশীয় ফ্রিল্যান্সারদের জন্য ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১০০% ট্যাক্স ফি, অফিস ভাড়া এবং ইউটিলিটি বিলের ৮০% ভ্যাট ফি মওকুফ, বিদেশী কর্মীদের জন্য প্রথম তিনবছরের জন্য ৫০% ট্যাক্স ফি মওকুফ করেছে সরকার।

২০২০ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার ফ্রিল্যান্সারকে স্মার্ট কার্ড দেওয়া হয়েছে ব্যাংক ঋণ সুবিধা পাওয়ার জন্য। এছাড়াও বিদেশী ৫৫টি স্বীকৃত প্ল্যাটফর্ম ও অনলাইন মার্কেটপ্লেসে কাজ করে আয় করলে ৪ শতাংশ নগদ প্রণোদনা দেওয়ার ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

এসব মার্কেটপ্লেসে লাখ লাখ বেকার তরুণ, এমনকি ঘরে বসে থাকা অল্প শিক্ষিত নারীরাও ফ্রিল্যান্সিং করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। বাংলাদেশে ২০১৪ সালে মাত্র ৯ শতাংশ নারী এ কাজ করত। বর্তমানে সাড়ে ৬ লাখ ফ্রিল্যান্সারের মধ্যে ১১ শতাংশ নারী (অর্থাৎ ৭১ হাজার ৫০০ জন)। এসব কাজে পুরুষদের আয় যেখানে ঘণ্টায় ২১.৫৭ পাউন্ড, সেখানে নারীদের আয় ২২.৪৩ পাউন্ড।

তবে এসব বৈদেশিক অর্থ দেশে আনতে বাংলাদেশের সঙ্গে পেপ্যালের কোনো চুক্তি না থাকায় অতিরিক্ত কমিশন খরচসহ রয়েছে নানা ভোগান্তি। আবার প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতার অভাবে বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সারদের পারিশ্রমিকও কম। বাংলাদেশী ফ্রিল্যান্সাররা সাধারণত গ্রাফিক্স ডিজাইন ও ওয়েব ডেভেলপমেন্টের মতো বিষয়ে বেশি প্রশিক্ষিত। এসব কাজে যেমন তুলনামূলক অর্থও কম, তেমনি প্রতিযোগী দেশগুলোর ফ্রিল্যান্সারদের মতো তারা দরকষাকষি করতে পারে না।

ভারতের একজন ফ্রিল্যান্সার যে কাজের ১১ ডলার দাবি করে, সেখানে বাংলাদেশীরা কাজটা করছে মাত্র ২-৩ ডলারে। অবশ্য স্নাতক ডিগ্রি, উচ্চমাধ্যমিক এবং এর কম শিক্ষাগত যোগ্যতার সম্পূর্ণ বাংলাদেশী ফ্রিল্যান্সারদের আয় ঘণ্টাপ্রতি যথাক্রমে ২০ ডলার, ১৬ ডলার এবং দুই ডলার হয়ে থাকে। যেহেতু ফ্রিল্যান্সিংয়ে বাংলাদেশের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। সরকার আরও পৃষ্ঠপোষক, বিনিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিলে এই সেক্টরে শিক্ষিত বেকার তরুণদের এমনকি নারীদেরও অংশগ্রহণ আরও বাড়বে। সফল ফ্রিল্যান্সারদের ভিআইপি সুবিধা (বিমান ও ট্রেনে যাতায়াত সুবিধা, অসুস্থতায় চিকিৎসার সুযোগ এবং বৃদ্ধ বয়সে বিশেষ ভাতা ইত্যাদি, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত করা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে।

যেহেতু ঘরে বসেই ফ্রিল্যান্সিং করা যায়, তাই এই পেশাকে শহর থেকে বেরিয়ে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো দ্রুতগতির ইন্টারনেট এবং স্বল্পমূল্যে উন্নত মানের ল্যাপটপ বৃদ্ধিতে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তাতে গ্রামীণ শিক্ষার্থীরা ফ্রিল্যান্সিংয়ে যেমন অনুপ্রাণিত হবে, তেমনি নব উদ্যমে তাদের এই অংশগ্রহণে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে দেশ মুক্তি পাবে।

পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিংয়ে বিদ্যমান সমস্যাগুলো যেমন- গুণগত প্রশিক্ষণ, পেমেন্ট সিস্টেম সহজীকরণ, ইন্টারনেট ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট দূরীকরণ, ফ্রিল্যান্সিং কাজ ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার নামে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎকারীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ নিশ্চিত করতে পারলে ফ্রিল্যান্সিং সেক্টর হতে পারে দেশের সবচেয়ে বড় রেমিটেন্স আয়ের খাত। সৃষ্টি হতে পারে লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানের মাধ্যম।

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই যাত্রাকে আরও ত্বরান্বিত করবে দেশের লাখ লাখ তরুণ সমাজ ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে বেকারত্ব রোধ করে এগিয়ে যাবে সামনের দিকে।

হীরেন পণ্ডিত: প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট ও রিসার্চ ফেলো
ফিডব্যাক: *hiren.bnnrc@gmail.com*
ছবি: ইন্টারনেট

অ্যামাজন স্টোরফ্রন্ট

বিশ্বজুড়ে ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার সম্পদ মূল্যের যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান 'অ্যামাজন.কম' তাদের সেলার হওয়ার সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে বৃহৎ কোম্পানিগুলোকে অফলাইন মার্কেটের পাশাপাশি অনলাইন জগতে বাজার প্রসারের সুযোগ দেয়ার মধ্যে দিয়ে ব্যবসার অবস্থান সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। আর বিক্রেতাদের একটি শক্তিশালী টুল হিসেবে 'অ্যামাজন স্টোর ফ্রন্ট' আবির্ভূত হয়েছে, যেই ডিজিটাল স্পেস ব্যবসাগুলোকে একটি ব্র্যান্ডেড অনলাইন স্টোর তৈরির অবস্থান তৈরি করে দিয়েছে অ্যামাজন ওয়েবসাইটের মধ্যে, যা কাস্টমারদের ভালো একটি কেনাকাটার অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

নাজমূল হাসান মজুমদার

অ্যামাজন স্টোরফ্রন্ট কি

ছোট ব্যবসার ওপর গুরুত্ব দিয়ে স্টোরফ্রন্ট আবার ২০১৮ সালে চালু হয়, যেখানে বিভিন্ন রেঞ্জের ইউনিক প্রোডাক্টগুলো প্রাধান্য পায়। এখানে ব্র্যান্ডগুলোকে সাপোর্ট দেয়া হয়েছে মার্কেটপ্লেসের মাধ্যমে, আর অ্যামাজন স্টোরফ্রন্টে, আপনি একাধিক পেজ স্টোর তৈরি করে সমস্ত প্রোডাক্ট কালেকশন প্রদর্শন করতে পারবেন একটি জায়গায়। আর ব্র্যান্ডিংসহ আপনার স্টোরটিকে লোগোসহ কাস্টমাইজ করতে সক্ষম হবেন এবং ব্র্যান্ড সচেতনতা বৃদ্ধির দারুণ একটি মাধ্যম। এখানে আপনি ব্র্যান্ডেড কনটেন্ট, ছবি দিয়ে ইউনিক ক্যাটালগ তৈরি করে কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স প্রদান করতে পারবেন। সেলাররা চাইলে 'নিউ এরাইভেল' অথবা 'বেস্ট সেলার' কালেকশন যোগ করতে পারেন। আর এই সমস্ত কিছু আপনার কোম্পানির প্রোডাক্ট বিক্রি ভালো করবে।

অ্যামাজন স্টোরফ্রন্টের জন্যে কি দরকার

সকল অ্যামাজন সেলার স্টোরফ্রন্ট তৈরির জন্যে যোগ্য নয়, তাদের নূন্যতম কিছু যোগ্যতা থাকা দরকার, যেমনঃ

ইনডিভিজুয়াল প্ল্যানঃ যেসব সেলার প্রতি মাসে ৪০ টি আইটেম'র কম প্রোডাক্ট বিক্রি করে তাদের জন্যে এই প্ল্যান। এরজন্যে কোন মাস ফি নেই, তার পরিবর্তে ০.৯৯ মার্কিন ডলার প্রতি প্রোডাক্ট বিক্রিতে প্রদান করতে হবে অ্যামাজনকে, এর সাথে অতিরিক্ত সেলিং ফি দিতে হবে। এই ধরণের প্ল্যান ক্ষুদ্র বিক্রেতাদের জন্যে উত্তম।

প্রফেশনাল সেলার অ্যাকাউন্টঃ স্টোরফ্রন্ট তৈরি করতে আপনাকে প্রফেশনাল সেলার অ্যাকাউন্ট

থাকতে হবে, অর্থাৎ, ফ্রি একক অ্যাকাউন্ট স্টোরফ্রন্ট সেটআপ এর জন্যে উপযুক্ত নয়। যদি আপনি অ্যামাজনে বিক্রিতে আগ্রহী হন এবং ব্র্যান্ড সকলের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত করতে চান, তাহলে প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টে আপগ্রেড করেন অ্যাকাউন্ট। প্রফেশনাল প্ল্যানে প্রতি মাসে ৩৯.৯৯ মার্কিন ডলার প্রতি মাসে দিতে হবে যদি ৪০ টির বেশি প্রোডাক্ট বিক্রি করতে পারেন। এই প্ল্যানে অ্যাডভান্সড সেলিং টুল এবং অ্যামাজন এডভার্টাইজিং প্ল্যাটফর্ম সুবিধা পাবেন, যা আপনার ব্যবসা ভালো করতে সাহায্য করবে।

অ্যামাজন ব্র্যান্ড রেজিস্ট্রিঃ প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করা অ্যামাজন ব্র্যান্ড রেজিস্ট্রি'তে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্টোরফ্রন্ট ইস্যুতে। ব্র্যান্ড রেজিস্ট্রি প্রোগ্রাম নকল হতে ব্র্যান্ডকে রক্ষা করে এবং প্রোডাক্ট লিস্টিংয়ে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে। এইজন্যে https://brandservices.amazon.com/ ঠিকানা থেকে ব্র্যান্ডকে রেজিস্ট্রেশন করুন।

ফুলফিলমেন্ট প্রক্রিয়া

আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কিভাবে ফুলফিলমেন্ট অর্ডার করতে হবে। অ্যামাজন দুই ধরণের ফুলফিলমেন্ট প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, যেমনঃ ফুলফিলমেন্ট বাই অ্যামাজন (এফবিএ) এবং ফুলফিলমেন্ট বাই মার্চেন্ট (এফবিএম)।

ফুলফিলমেন্ট বাই অ্যামাজন (এফবিএ) :

আপনাকে প্রোডাক্টটি অ্যামাজনের ফুলফিলমেন্ট সেন্টারে প্রেরণ করতে হবে এবং অ্যামাজন স্টোরেজ, শিপিং এবং কাস্টমার সার্ভিসের সকল কিছু দেখভাল করে। এই প্রক্রিয়া অ্যামাজনে বিস্তৃত পরিসরে শিপিং নেটওয়ার্ক এবং কাস্টমারের আস্থাশীলতা ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়।

ফুলফিলমেন্ট বাই মার্চেন্ট (এফবিএম) :

স্টোরেজ, শিপিং এবং কাস্টমার সার্ভিস নিজ দায়িত্বে করতে হবে। এই প্রক্রিয়া ফুলফিলমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করে এবং অর্থ সাশ্রয়ী, বিশেষ করে যদি আপনার নিজস্ব ওয়্যারহাউস অথবা স্টোরেজ স্পেস থাকে। এইক্ষেত্রে আপনাকে সকল

প্রকার কাজের দায়িত্ব নিতে হবে।

প্রোডাক্ট লিস্টিং তৈরি

একবার আপনি সেলিং প্ল্যান এবং ফুলফিলমেন্ট প্রক্রিয়া বাছাই করে ফেললে, আপনাকে প্রোডাক্ট লিস্টিং করা প্রয়োজন যেসব প্রোডাক্ট বিক্রি করতে চান।

* পরিষ্কার এবং সুনির্দিষ্ট প্রোডাক্ট টাইটেল লিখতে হবে, যা প্রাসঙ্গিক কিওয়ার্ডে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
* বিস্তারিত প্রোডাক্ট তথ্য প্রদান করতে হবে, যা ফিচার এবং সুবিধা উল্লেখ করে বিশেষ করে প্রোডাক্টের। পয়েন্ট করে ডেসক্রিপশন দিতে হবে যাতে সকলের জন্যে পড়তে সুবিধা হয়।
* উচ্চমান সম্পন্ন প্রোডাক্ট ছবি যুক্ত করা, যাতে বিভিন্ন দিক থেকে প্রোডাক্ট প্রদর্শন করা যায়। অ্যামাজন সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে অন্তত পক্ষে ১০০০ ১০০০ পিক্সেল রেজুলেশন ছবি দরকার।
* প্রতিযোগিতামূলক মূল্য প্রোডাক্টের জন্যে নির্ধারণ করা মার্কেট রিসার্চ এবং টার্গেট প্রফিট মার্জিন এর কথা চিন্তা করে।
* প্রাসঙ্গিক প্রোডাক্ট তথ্য, আকার, ভর, রঙ এবং ম্যাটারিয়েল এসব প্রোডাক্ট ডিটেইল সেকশনে অন্তর্ভুক্ত করা।
* অ্যামাজন কিওয়ার্ড রিসার্চ টুল ব্যবহার করা প্রাসঙ্গিক সার্চ টার্ম লক্ষ্য এবং প্রোডাক্ট লিস্টিংয়ে যুক্ত করা সার্চ রেজাল্ট উন্নত করাতে।

অ্যামাজন স্টোরফ্রন্টের সুবিধা

ব্র্যান্ডের জন্যে অনেক সুবিধা প্রদান করে অ্যামাজন স্টোরফ্রন্ট, যার মধ্যে কিছু উল্লেখ করা হলঃ

কিউরেটেড ব্র্যান্ড ডেস্টিনেশন

আপনার অ্যামাজন স্টোর আপনার সমস্ত প্রোডাক্ট প্রদর্শন করার সময় আপনার গ্রাহকদের আপনার ব্র্যান্ড সম্পর্কে জানায়। প্রোডাক্ট সম্পর্কে পৃথকভাবে অনুসন্ধান করার পরিবর্তে ক্রেতারা সকল প্রোডাক্টের ক্যাটালগ সম্পর্কে জানতে পারে। আপনার ব্র্যান্ডের গল্প জানানো, বিশ্বাস তৈরি এবং প্রদর্শনের সুযোগ তৈরি করবে। ব্র্যান্ড স্টোরগুলোর নিজস্ব কাস্টম ইউআরএল থাকে, যেমনঃ Computerjagat.com/store/

কম্পিটিটর বিজ্ঞাপন নেই

ঐতিহ্যগত পণ্য তালিকার বিপরীতে অ্যামাজন স্টোরফ্রন্ট প্রতিযোগী বিজ্ঞাপন থেকে মুক্ত, অর্থাৎ, যখন একজন কাস্টমার আপনার প্রোডাক্টে ক্লিক করবেন অ্যামাজন ওয়েবসাইটে তাদের অন্যকোন সেলারের বিজ্ঞাপন দেখানো হবেনা। এটি শুধুমাত্র তাদের কেনাকটার অভিজ্ঞতা আনন্দময় করবেনা, বরং এটি নিশ্চিত করবে ক্লিকের জন্যে অর্থ প্রদান করছেনা, যার জন্যে একজন সেলার বিক্রয় পাচ্ছেন।

ক্রিয়েটিভ ব্র্যান্ডিং

আপনার বিজ্ঞাপন সৃজনশীলতা নমনীয় করার এবং প্রোডাক্টগুলির জন্যে দুর্দান্ত ছবি, ইনফোগ্রাফিক্স বা এমনকি ভিডিও স্টোরটিকে সম্পূর্ণরুপে কাস্টমাইজ করার সুযোগ রয়েছে। ব্র্যান্ড স্টোরের জন্যে প্রয়োজনীয় আবহ এবং এ+ ক্যাটাগরির কনটেন্ট দেয়ার জন্যে কনটেন্ট থাকবে।

স্টোরে সরাসরি ট্র্যাফিক প্রেরণ করে

স্পন্সরড ব্র্যান্ড বা ডিসপ্লে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আপনার অ্যামাজন স্টোরে সরাসরি ট্র্যাফিক প্রেরণ করতে পারবেন। এটি আপনার প্রতিযোগীদের প্রোডাক্ট থেকে কাস্টমারদের দূরে সরিয়ে রাখার অনুমতি দেয়। সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট যেমনঃ ফেসবুক, টুইটার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে বা ইমেইল মার্কেটিং করতে পারেন। ব্র্যান্ডগুলি অ্যামাজন আট্রিবিউশন ব্যবহার করে অফ-অ্যামাজন ট্র্যাফিকের কর্মক্ষমতা ট্র্যাক করতে পারে, যা আপনি স্টোরফ্রন্টে পাঠান। এছাড়া কাস্টমাররা ব্র্যান্ড নাম দিয়ে ক্লিক করে স্টোর খুঁজে পেতে পারে।

মাল্টিপল পেজ এবং সাবক্যাটাগরি যোগ

যদি আপনার ব্র্যান্ডের একাধিক প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি এবং সাবক্যাটাগরি থাকে, তাহলে আপনি সাবপেজ তৈরি করে হোস্ট করতে পারেন। যেমনঃ যদি আপনি রান্নাঘরের প্রোডাক্ট বিক্রি করেন, তাহলে কফি মেশিন, টোস্টার, এয়ার ফ্রায়ার ইত্যাদি পেজ তৈরি করতে পারেন।

স্টোর ইনসাইট ড্যাশবোর্ড

ড্যাশবোর্ডটি স্টোরে কোথা থেকে ট্র্যাফিক আসছে সেটা খুঁজে বের করে প্রদর্শন করে কিভাবে বিক্রয় হচ্ছে, পেজ ভিউ পর্যবেক্ষণ করে, এই কি পারফর্মেন্স ইন্ডিকেটর নিশ্চিত করে কিভাবে প্রোডাক্ট মার্কেট এবং স্টোর করবেন সেটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে।

মোবাইল ফ্রেন্ডলি ডিজাইন

যখন অ্যামাজন স্টোর তৈরি করবেন, তখন মোবাইলের জন্যে অপটিমাইজ হতে হবে, কারণ ১২৬ মিলিয়ন মোবাইল ব্যবহারকারী অ্যামাজন অ্যাপ ব্যবহার করে প্রোডাক্ট ক্রয় করে।

উচ্চ কনভার্সন রেট

অ্যামাজন প্রোডাক্ট লিস্টিং থেকে ভিন্নভাবে ব্র্যান্ড প্রদর্শনের সুযোগ দিবে অ্যামাজন স্টোর, যখন কাস্টমার আপনার স্টোর ভিজিট করবে, তখন কনভার্সন হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে এবং প্রোডাক্ট আপনার থেকে কেনার সুযোগ তৈরি হবে।

অ্যামাজন স্টোরফ্রন্ট কিভাবে তৈরি করবেন

অ্যামাজন স্টোরফ্রন্ট তৈরি করতে, সেলার অ্যাকাউন্ট https://sellercentral.amazon.com/ থেকে সাইনআপ করে সেলার অ্যাকাউন্ট প্রথমে তৈরি করতে হবে। সেজন্যে অ্যাকাউন্ট করতে প্রয়োজনীয় তথ্য যেমনঃ ব্যবসার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, এবং ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর প্রদান করতে হবে।

ব্র্যান্ড রেজিস্ট্রি

প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে আপনার ব্র্যান্ড অ্যামাজনে রেজিস্টারকৃত। যদি রেজিস্টার্ড না হয় তাহলে অ্যামাজন ব্র্যান্ড রেজিস্ট্রি প্রোগ্রামের

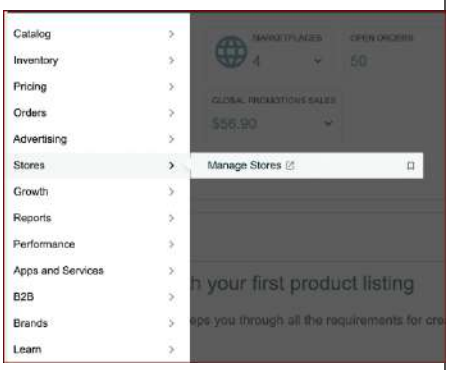

জন্যে আবেদন করুন। এটি অ্যামাজনে ব্র্যান্ডকে সুরক্ষিত এবং কাস্টমারের কাছে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে। যখন আবেদন করবেন ব্র্যান্ড রেজিস্ট্রি'র জন্যে অ্যামাজনে তখন যে বিষয়গুলি খেয়াল করবেন সেগুলি হলোঃ

* ইউনাইটেড স্টেট প্যাটেন্ট এবং ট্রেডমার্ক অফিস'তে ব্র্যান্ড নাম রেজিস্টার হতে হবে।
* ব্র্যান্ড সিরিয়াল নম্বর (ইউএসপিটিও রেজিস্টার্ড) হতে হবে।
* প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এবং বণ্টনের দেশগুলোর লিস্ট থাকা।
* ব্র্যান্ডের নামের ছবি এবং প্রোডাক্ট লেভেল ছবি এবং প্রোডাক্টের ছবি।

স্টোর সেটআপ

সেলার সেন্ট্রাল থেকে, 'স্টোর' ট্যাবে গিয়ে 'ম্যানেজ স্টোরে' ক্লিক করুন। 'ঈৎবধঃব ঝঃড়ৎব' তে ক্লিক করুন এবং আপনার ব্র্যান্ড বাছাই করুন। আপনার ব্র্যান্ড শুধুমাত্র প্রদর্শিত হবে তখন যখন ব্র্যান্ড রেজিস্ট্রি তালিকাভুক্ত হবে।

এখন স্টোর বিল্ডারে আপনি থাকবেন, এই ধাপে আপনার ব্র্যান্ডের নাম এবং লোগো যুক্ত করতে হবে, লোগো সাইজ ৪০০ ী ৪০০ পিক্সেল। এরপরে নেক্সট'তে ক্লিক করতে হবে।

হোমেপেজ তৈরি

কাস্টমার কেমন দেখবে স্টোরে প্রবেশের পরে, সেজন্যে হোমপেজ তৈরি করতে হবে। অ্যামাজন বেশকিছু ট্যামপ্লেট প্রদান করবে বাছাই করতে, যেখানে আপনি ব্র্যান্ড সম্পর্কে গল্প বলতে পারবেন, বেস্ট সেলিং প্রোডাক্টকে হাইলাইট করতে পারবেন, অথবা একটি গ্রিডে সকল প্রকার প্রোডাক্ট প্রদর্শন করতে পারবেন। শুন্য একটি পেজ থেকে এটা শুরু করতে পারেন। আপনাকে মেটা ডেসক্রিপশনে তথ্য দিতে হবে, যা সার্চইঞ্জিনে আপনার পেজ সম্পর্কে বলবে। এই টেক্সট গুগল সার্চে অ্যামাজন স্টোরকে স্নিপেট হিসেবে জায়গা পেতে সাহায্য করবে, ভিউয়ারকে প্রোডাক্ট অথ বা ব্র্যান্ড সম্পর্কে একটা প্রিভিউ দিবে। সেকশন করে হেডার, টেক্সট, ইমেজ যুক্ত করে পেজকে আরও বেশি প্রাণবন্ত করতে পারবেন। মেটা ডেসক্রিপশনে ১৫০ থেকে ১৬০ অক্ষরের মধ্যে হতে হবে। আপনি বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন রকম কনটেন্ট দিয়ে সাজাতে পারেন, যেমনঃ সরাসরি প্রোডাক্ট পেজের সাথে লিংক করতে পারেন প্রোডাক্ট অঝওঘ যোগ করে। উচ্চমানের ছবি ব্যবহার করুন, যেটা ভিজুয়ালি প্রোডাক্ট অথবা ব্র্যান্ডকে প্রদর্শন করে। ইমেজ'র সাথে টেক্সট, যেটা বিস্তারিতভাবে ইমেজ বা ছবির ক্যাপশন বা বর্ণনা প্রদান করে। আর শপেবল ইমেজ, যেটাতে কাস্টমার ক্লিক করে প্রদর্শিত প্রোডাক্ট কিনতে পারেন। টেক্সট, যা পুরোপুরিভাবে ব্র্যান্ড বা প্রোডাক্ট'র তথ্য প্রদান করে। ভিডিও কাস্টমার এনগেজ করার অন্যতম মাধ্যম এবং এর মাধ্যমে প্রোডাক্ট প্রদর্শিত হয়, আর ব্যাকগ্রাউন্ড ভিডিও ডায়নামিক এলিমেন্ট যোগ করে হোমপেজে এবং ভার্চুয়ালি আরও গ্রহণযোগ্য করে।

সাব ক্যাটাগরি এবং প্রোডাক্ট তৈরি

আপনার স্টোরে সাব ক্যাটাগরি তৈরি করতে পারবেন অ্যামাজন স্টোরফ্রন্ট সেটআপে প্রোডাক্ট সন্নিবেশ করে। আপনি সাব ক্যাটাগরি পেজ অনুযায়ী যোগ করতে পারবেন। প্রত্যেক সাব ক্যাটাগরি পেজে একটি টাইটেল, মেটা ডেসক্রিপশন, টেমপ্ল্যাট সিলেকশন প্রয়োজন। টেমপ্ল্যাট যেমনঃ 'প্রোডাক্ট হাইলাইট' অথবা 'প্রোডাক্ট গ্রিড' সাব ক্যাটাগরিতে প্রোডাক্ট প্রদর্শন করবে। আপনি ড্রপডাউন মেন্যু যোগ করে আরও ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট করতে পারেন সাব ক্যাটাগরির মধ্যে। এই ড্রপ ডাউন মেন্যু কাস্টমারের জন্যে শপিং অভিজ্ঞতাকে গতিশীল করবে।

হেডার যোগ

হেডার খুব গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে আপনার ব্র্যান্ড লোগো অথবা ব্র্যান্ডেড ইমেজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে করে কাস্টমাররা জানবে তারা আপনার স্টোরে রয়েছে, ৩০০০ x ৬০০ পিক্সেল এর ইমেজ হতে হবে। এতে করে ভিজিটররা ব্র্যান্ডের সাথে এনগেজ হবে, খেয়াল রাখতে হবে প্রোডাক্ট এবং টার্গেট অডিয়েন্স'র সাথে ব্র্যান্ড সামাঞ্জস্য কিনা।

কাস্টমাইজ স্টোর সেকশন

স্টোর পেজ কাস্টমাজেবল টাইলস সেকশন ধারণ করে, প্রত্যেক টাইল কনটেন্টে অন্তর্ভুক্ত থাকে যেমনঃ টেক্সট, ইমেজ, ভিডিও এবং প্রোডাক্ট। প্রত্যেক পেজে সর্বমোট ২০ সেকশন থাকে, যা ৪ টি ব্যাকগ্রাউন্ড ভিডিও টাইলস, একটি প্রোডাক্ট গ্রিড টাইল, একটি গ্যালারি টাইল, একটি ফিচারড ডিলস টাইল এবং একটি রিকমেন্ড প্রোডাক্ট টাইল দ্বারা গঠিত। প্রোডাক্ট গ্রিড ৪ টি অথবা তার অধিক পুরো বিস্তৃত গ্রিড লে-আউটে প্রোডাক্ট প্রদর্শন করে। প্রোডাক্টের নাম, ইমেজ, প্রাইম বেডজ, মূল্য, স্টার রেটিং এবং শপিং অ্যাকশন প্রদর্শিত হয়। ২ টি লে-আউট অপশন রয়েছে ইমেজসহ টেক্সট টাইল। একটি টেক্সট ওভার ইমেজ, যেটা স্টোর পেজ অথবা প্রোডাক্ট ডিটেইল পেজে লিংক করা, মাল্টিপল টেক্সট এলিমেন্ট যোগ যেমনঃ প্রিফিক্স, হেডিং, বডি এবং লিংক টেক্সট। টেক্সট আকার, কনটেন্ট পেডিং এবং এলাইমেন্ট বাছাই করতে হবে। রঙ এবং টেক্সট ওভারলে ইমেজ'র ওপর কনফিগার করা। আরেকটি 'নেক্সট টু ইমেজ' এই লে-আউট ইমেজের পাশে টেক্সট যুক্ত করে, এটি একটি হেডার এবং ডেসক্রিপশন টেক্সট'র অন্তর্ভুক্ত। 'বেস্ট সেলার টাইল' ৫ টি সেরা বিক্রিত প্রোডাক্ট একই সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে

প্রদর্শন করে। ক্যাটালগ অনুযায়ী ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট স্টোরে প্রদর্শিত হবে।

প্রিভিউ

একবার আপনার স্টোরফ্রন্টের সকল এলিমেন্ট একসাথে রাখেন, তাহলে প্রিভিউ করেন আপনার কাজ নিশ্চিত করতে যে সকল কিছু ভালোভাবে কাজ করছে পাবলিশের আগে। চৎবারবৎ বাছাই করুন ড্রপডাউন মেন্যু নির্ধারণ করুন। ব্যাকরণগত ইস্যু, বানান ভুল অথবা ইমেজ সকল কিছু চেক করতে হবে। এইসকল কিছু প্রফেশনাল লুক দিবে স্টোরফ্রন্টকে। খেয়াল রাখতে হবে সকল লিংক, বাটন সঠিকভাবে কাজ করছে। মোবাইল এবং ডেস্কটপ থেকে স্টোরফ্রন্ট কাজ করছে সেটা প্রিভিউ করা।

সাবমিট ফর পাবলিশ

একবার স্টোরফ্রন্ট প্রিভিউ হলে এবং দেখতে ভালো হলে এবং কাজ করলে, অ্যামাজন রিভিউ এর জন্যে পাঠাতে হবে। 'ঝঁনসরঃ ভড়ৎ চঁনষরংযরহম' দিয়ে অ্যামাজনে অনুমোদনে দিতে হবে। রিভিউ প্রসেস সাধারণত ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত সময় নেয়, কিন্তু অ্যামাজন রিভিউ'র জন্যে আরও বেশি লাগতে পারে। সেজন্যে ধৈর্য ধরতে হবে। একবার অনুমোদন পেলে, আপনার স্টোরফ্রন্ট লাইভ হবে এবং কাস্টমারের ভিজিট'র জন্যে প্রস্তুত হবে। স্টোরফ্রন্ট তৈরি শুরু মাত্র, যেহেতু ব্র্যান্ড এবং প্রোডাক্ট ক্যাটালগ ক্রমবিকশিত হবে, এবং কৌশলের সাথে সামাঞ্জস্য হবে সর্বোচ্চ বিক্রির জন্যে।

ভ্যানিটি ইউআরএল অ্যামাজন স্টোরফ্রন্ট পেজে

স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যামাজনে ভ্যানিটি ইউআরএল যোগ করা যায়না নতুন তৈরি অ্যামাজন স্টোর পেজে। ৬ টি ধাপে আপনি ভ্যানিটি ইউআরএল পেতে পারেন।

* সেলার সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্টে প্রবেশ।
* মূল নেভিগেশন থেকে, স্টোর ট্যাবে ক্লিক করে।
* এরপরে সেটিংস ট্যাবে ক্লিক।
* 'Store Url' তে 'Change' বাটনে ক্লিক করতে হবে।
* আপনার পছন্দের অ্যামাজন স্টোরফ্রন্ট ইউআরএল প্রদান।
* এরপরে SAVE বাটনে ক্লিক করতে হবে।

অ্যামাজন ইউআরএলে যেই গাইডলাইন ভ্যানিটি ইউআরএলে অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে, সেগুলো হলোঃ

* ব্র্যান্ড সম্পর্কিত
* স্বাভাবিক অক্ষর প্রদান
* ট্রেডমার্ক অথবা কপিরাইট বিষয়ে কোন সমস্যা না হয়।
* অ্যামাজন পলিসি অনুসরণ।

ভ্যানিটি ইউআরল যেমন হবে অ্যামাজনে, যেমনঃ amazon.com/keyword

অ্যামাজন স্টোরফ্রন্ট প্রচারণা

সেটআপ করার পর অ্যামাজন স্টোরফ্রন্ট প্রচারণা এবং ট্র্যাফিক পরিচালনা করতে হবে। কিছু কার্যকরী কৌশল উল্লেখ করা হলো, যেমনঃ

অ্যামাজন বিজ্ঞাপন ব্যবহারঃ অ্যামাজন বিভিন্ন রকমের বিজ্ঞাপন সমাধান প্রদান করে, যেমনঃ স্পন্সরড প্রোডাক্ট, স্পন্সরড ব্র্যান্ড, এবং ডিসপ্লে অ্যাড; যা বিস্তৃত পরিসরে কাস্টমারের কাছে পৌঁছাতে এবং বেশি প্রোডাক্ট বিক্রি করতে সাহায্য করবে।

প্রোডাক্ট লিস্টিং অপটিমাইজ করাঃ নিশ্চিত করুন প্রোডাক্ট লিস্টিং প্রাসঙ্গিক কিওয়ার্ড ব্যবহারে এবং সঠিক প্রোডাক্ট তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সার্চ করে বের করার জন্যে অপটিমাইজ।

সোশ্যাল মিডিয়াঃ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, পিন্টারেস্ট'র মতন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অ্যামাজন স্টোরফ্রন্ট প্রচারণা করা বেশি মানুষের কাছে রিচ হতে। এনগেজ কনটেন্ট যেমনঃ প্রোডাক্ট নির্দিষ্ট করে দেয়া, কাস্টমার রিভিউ, এবং প্রমোশনাল করা ফলোয়ারদের স্টোরফ্রন্ট ভিজিট করতে।

ইনফ্লুয়েন্সারের সাথে সহযোগিতাঃ আপনার প্রোডাক্ট নিশের ইনফ্লুয়েন্সারদের সাথে পার্টনারশিপ করা অ্যামাজন স্টোরফ্রন্ট এবং প্রোডাক্ট'র প্রচার করা। নতুন কাস্টমারের কাছে পৌঁছাতে এবং ব্র্যান্ড জনপ্রিয়তা তৈরিতে এবং ট্র্যাফিক তৈরিতে সাহায্য করে।

অফার প্রোমোশন এবং ডিসকাউন্টঃ কাস্টমারদের স্টোরফ্রন্ট ভিজিট এবং প্রোডাক্ট কিনতে ডিসকাউন্ট অথবা ফ্রি শিপিং এর মাধ্যমে অফার করা। খেয়াল রাখতে হবে স্টোরফ্রন্ট, প্রোডাক্ট লিস্টিং এবং সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেল'র মাধ্যমে প্রচারণা করা।

একটি অ্যামাজন স্টোরফ্রন্ট তৈরি করা বিশ্বের বৃহত্তম ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে আপনার ব্র্যান্ডের উপস্থিতি বাড়ানোর শক্তিশালী উপায়। কার্যকরভাবে আপনার স্টোরফ্রন্ট তৈরি, পরিচালনা এবং অপটিমাইজ করার মাধ্যমে, আপনি আপনার গ্রাহকদের জন্যে একটি চমৎকার কেনাকাটার অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পারেন, ব্র্যান্ডের আনুগত্য বাড়াতে পারেন এবং সম্ভাব্যভাবে আরও বিক্রয় চালাতে পারেন। যদিও প্রক্রিয়াটির জন্য সতর্ক পরিকল্পনা এবং চলমান ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন, আপনার ব্র্যান্ডের উপর সম্ভাব্য প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রচুর সুবিধা প্রদান করে।

Comjagat Technologies was formed in 2007 with the vision of servicing our consumers with the most cutting edge solutions and services. We provides Live Webcasting services to Goverment Organization, Business Organization, NGO's, Educational Institutions, other types of organizations and individuals. We also provides end-to-end software solutions for private, government, and state agencies. It has **18 years'** experience in this area and covered **2000+** local and international events.

GOCON

Our Service

- Live Webcast
- High Quality Video Camera
- Online Archive
- Multimedia Support
- Switching Panel
- Seminar, Workshop
- Press Conference
- AGM or EGM
- Townhall Meeting
- Video Conferencing

Offer LIVE Webcasting and Video Conferencing

facebook LIVE YouTube LIVE WWW LIVE

Video Conferencing Solution

comjagat TECHNOLOGIES

01711936465
01670223187

Visit us
Boshoti Legacy, House #29, Road# 6, Dhanmondi, Dhaka 1205
email: project.coordinator@e-jagat.com

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপযোগী শিক্ষায় জোর দিতে হবে

হীরেন পণ্ডিত

একটি জাতির সামগ্রিক সমৃদ্ধি অর্জন ও অগ্রগতির প্রশ্নে শিক্ষার যথ যথ বিকাশ জরুরি। আর সেই লক্ষ্যে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। প্রসঙ্গত, বিশ্বের নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে দেশে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যের কথা জানিয়েছেন নীতি নির্ধারকবৃন্দ। যত টাকা লাগে আমাদের তা বিনিয়োগ করতে হবে। যত নামিদামি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে- তারা কীভাবে শিক্ষা দেয়, কী কারিকুলাম শেখায়, কীভাবে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে, আমাদের তা অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশে তৈরি করতে হবে। সেই সঙ্গে হাতে কলমে শিক্ষা, যাতে করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

আমাদের পরিকল্পনা যুগোপযোগী করা প্রয়োজন এবং তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ- যা আমলে নিয়ে সংশ্লিষ্টদের কাজ করতে হবে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও তার যথাযথ বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা খুব জরুরি। কেননা, বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে হলে এবং সময়ে সঙ্গে সঙ্গে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা জরুরি। আর সেই বিষয়টি আলোকপাত করে আমাদের আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা ভাবতে হবে এবং তার যথার্থ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ অপরিহার্য।

এছাড়া, বর্তমান সময়ে প্রযুক্তি সারা পৃথিবীতে কতটা অগ্রসর হয়েছে এবং এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফলে সার্বিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে প্রযুক্তি জ্ঞান অপরিহার্য। এক্ষেত্রে এটাও বলার দরকার, প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জাতি গড়ে তুলতে হবে কারণ আমরা কখনো পিছিয়ে থাকব না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের চলতে হবে। এজন্য আমরা চাই ছোট্ট বয়স থেকে আমাদের ছেলেমেয়েরা কম্পিউটার শিখবে, প্রযুক্তি শিখবে। আমরা মনে করি, এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে সংশ্লিষ্টদের আরো বেশি তৎপর হতে হবে। প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জাতি তৈরিতে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে। এছাড়া ক্লাসের বই মনোযোগ দিয়ে পড়ার পাশাপাশি জ্ঞান আহরণের জন্য অন্যান্য বই ও পড়ার বিষয়টিও আলোকপাত করতে হবে, যার গুরুত্ব অপরিসীম। ফলে জ্ঞান অর্জনে ক্লাসের বই পড়ার পাশাপাশি অন্যান্য বই পড়ায় আগ্রহ তৈরিতেও উদ্যোগী হতে হবে।

বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করার কথা বলা হয় সব সময় তা করতে হলে শিক্ষিত জাতি ছাড়া এটা সম্ভব নয়। আমাদের ভবিষ্যৎ কাজ হলো প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন প্রজন্ম গড়ে তোলা। এ জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন প্রযুক্তিতে দক্ষ জনগোষ্ঠী। আর এ কাজে বহুমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে ছেলেমেয়েদের। ফলে এই দিকটিকে সামনে রেখেও শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে হবে। শিক্ষার অগ্রগতি নিশ্চিত করতে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ কথা ভুলে যাওয়া যাবে না, শিক্ষা একটি জাতির মেরুদণ্ড। ফলে জাতির সামগ্রিক অগ্রগতিতে শিক্ষার ভূমিকা অগ্রগণ্য। আর তাই শিক্ষার প্রতিটি স্তরে যে কোনো সংকট থাকলে যেমন তা নিরসন করতে হবে, তেমিন শিক্ষার বিস্তার এবং শিক্ষার মান নিশ্চিত করার প্রশ্নে সর্বাত্মক উদ্যোগ অব্যাহত রাখারও বিকল্প নেই।

কিন্তু আমরা শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনবাদী প্রচেষ্টার বাস্তব সাফল্য এখনো দেখতে পাইনি। বরং প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমাদের তরুণরা যে চাকরি জোগাড় করতে পারে না, তা বিভিন্ন

জরিপে ফুটে উঠেছে। উদ্যোক্তা হওয়ার প্রয়োজনীয় শিক্ষাও তরুণদের আমরা দিতে পারছি না। সম্প্রতি এক জরিপে ৫ হাজার ৬০০-এর মতো তরুণ উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে। তাদের ৬৮.৬ শতাংশই জানিয়েছে, চলমান শিক্ষা তাদের কাঙ্ক্ষিত মানের কর্মসংস্থান প্রদানে উপযুক্ত নয়। অন্যদিকে ৬৯.৬ শতাংশ বলেছে, একজন উদ্যোক্তা হওয়ার মতো প্রস্তুতি নেয়ার শিক্ষাও তারা পাচ্ছে না। শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগের চাহিদা মেটাতে কী ধরনের সংস্কার দরকার- এমন প্রশ্নের উত্তরেও জরিপে অংশগ্রহণকারীরা যথেষ্ট সুচিন্তিত মতামত দিয়েছে। তাদের ৫৭.৭ শতাংশ মনে করে, শিক্ষার উন্নতি শিক্ষকের মানোন্নয়নের ওপর নির্ভর করবে। ৪৪.৪ শতাংশ মনে করে নেতৃত্ব, যোগাযোগ এবং 'সফট স্কিল' বিষয়ে প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। ৪১ শতাংশের ধারণা, ডিজিটাল সাক্ষরতা অর্জন এখনো বেশ চ্যালেঞ্জিং। আর ৩৫ শতাংশের ধারণা, 'ক্রিটিক্যাল থিংকিং' বা সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনাকে শিক্ষা ভাবনার মূলে আনা চাই। এই বাস্তবতাতেই বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা প্রযুক্তি শিক্ষার ধারণাটি সামনে নিয়ে এসেছেন।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ব্লক চেইন, রোবোটিকস অ্যান্ড বিগ-ডাটা সমন্বিত ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে হবে। খুব সংক্ষেপে আমাদের আগামীর সামষ্টিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বাস্তবায়নের পথনকশাটিই বেছে নিতে হবে। সারা পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়েই এই নবযাত্রার সূচনা করতে হবে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, বাংলাদেশের সমাজ এবং অর্থনীতিও বদলে গেছে। একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার জাতীয় লক্ষ্য আমাদের সামনে। এ জন্য আসলেই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির ভিত্তি তৈরি করার বিকল্প নেই।

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের যে অমিত সম্ভাবনা রয়েছে, তা সর্বজনবিদিত। সমতুল্য অন্য দেশগুলোর থেকে জনশক্তির গড় বয়সের বিচারে আমরা অনেকখানি এগিয়ে আছি। জাতিসংঘের হিসাব বলছে, ২০২১-এ আমাদের মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ 'ওয়ার্কিং এইজ পপুলেশন' ১৮-৬৪ তথা শ্রমবাজারে নিয়োজিত হওয়ার উপযোগী বয়সের মানুষ। তাদের প্রক্ষেপণ বলছে, ২০৩০ নাগাদ এই অনুপাত আরো ২ পয়েন্ট বেড়ে ৫৭ শতাংশ হবে। তবে এই জনসংখ্যাকে প্রকৃত অর্থেই জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে তাদের জন্য যুগোপযোগী বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রযুক্তি ব্যবহারের উপযোগী মানবসম্পদ তৈরির জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতিরও ডিজিটালাইজেশন দরকার। বিশেষত করোনাকালে আমরা শিক্ষাদান পদ্ধতির ডিজিটালাইজেশনের প্রয়োজনীয়তাটুকু বেশি করে অনুভব করেছি।

ওই সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সশরীরে উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হওয়ায় যে ক্ষতি হচ্ছিল, তা পুষিয়ে নিতে সরকারি ও অসরকারি অংশীজনরা নানামুখী ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে দূরশিক্ষণের ব্যবস্থা করায় কিছুটা উপকার হয়েছিল। কিন্তু সবার পক্ষে দূরশিক্ষণের সুফল সমানভাবে ভোগ করা সম্ভব হয়নি। কেননা দেশের ৪০ শতাংশেরও কম মানুষের ইন্টারনেট অ্যাকসেস আছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরও মাত্র ৪৫ শতাংশের উপযোগী ইন্টারনেট কানেকশন ছিল বলে এক জরিপ থেকে জানা গেছে।

দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনে আমাদের এখনো অনেক উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে। তবে এরই মধ্যে নানামুখী সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগগুলো থেকে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেগুলো বিশেষ সহায়ক হবে বলেই মনে হয়। টেলিকম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকারের আইসিটি মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীরা একাধিক লার্নিং প্ল্যাটফর্ম নিয়ে কাজ করছেন। এ ছাড়া ব্যক্তি খাতেও আমাদের একাধিক লার্নিং প্ল্যাটফর্ম আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়েছে বলা যায়। কাজেই শিক্ষাদান পদ্ধতির ডিজিটালাইজেশনের গুরুত্ব আমাদের নীতিনির্ধারকরা ঠিকই উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। তবে তাদের চেয়েও এগিয়ে রয়েছে আমাদের তরুণ সমাজ।

এরই মধ্যেই প্রায় ৮-১০ লাখ তরুণ ডিজিটাল কর্মী বা স্বউদ্যোক্তা নিজে নিজেই প্রযুক্তি রপ্ত করে ফ্রিল্যান্সিং কাজে যুক্ত হতে পেরেছে। তারা করে করে শেখার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অনুমান করা যায়, এরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যদি ভাষা ও প্রযুক্তি আরেকটু ভালোভাবে শিক্ষিত হতো, তাহলে তাদের এই দক্ষতা অর্জনের গতি কতটা ক্ষীপ্র হতে পারত। তবে করে শেখার গুরুত্বকে খাটো করে দেখার উপায় নেই।

সংখ্যাবাচক দিকগুলো অর্জনে আমরা যে সাফল্য দেখাতে পেরেছি, গুণবাচক দিকগুলো বাস্তবায়নে ততটা সফল হতে পারিনি। সবার জন্য শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার কাজটি আমরা ভালোভাবেই সম্পন্ন করতে পেরেছি। তবে শিক্ষার গুণমান এবং কর্মমুখিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমাদের আরো অনেক কাজ যে বাকি- তা মানতেই হবে।

এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথমেটিকস তথা স্টেম বিষয়ে শিক্ষার দিকে। আমাদের সামনে যে সময়োচিত লক্ষ্য এসেছে, তা বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো জনশক্তিকে আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তোলা। সমকালীন বিশ্ব ও দেশীয় বাস্তবতায় শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সুদূরপ্রসারী কৌশল বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের গ্রহণ করতে হবে।

হীরেন পণ্ডিত: প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট ও রিসার্চ ফেলো
ফিডব্যাক: *hiren.bnnrc@gmail.com*
ছবি: ইন্টারনেট

এআই নিয়ে শঙ্কিত সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানও

সাইবার নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ কর্মকান্ডে এআই-এর ব্যবহারের বাড়ার সাথে র‍্যানসমওয়্যারের হুমকি আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সাইবার আক্রমণকে আরো জটিল করার শঙ্কা রয়েছে। শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত গ্লোবাল সাইবার নিরাপত্তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ক্যাসপারস্কির বার্ষিক সাইবার-সিকিউরিটি উইকেন্ড (৪-৭ আগষ্ট) ফর এশিয়া প্যাসিফিক কান্ট্রিস ২০২৪ এমনটা তুলে ধরা হয় বিভিন্ন উপস্থাপনায়। এতে বাংলাদেশের স্টেক হোল্ডাররাও অংশ নেন। একইসঙ্গে বাংলাদেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাতের সুরক্ষার বিষয়টিও উঠে আসে সম্মেলনে।

সম্মেলনে এশিয়া প্যাসিফিকের সাম্প্রতিক সাইবার সিকিউরিটি ডেভেলপমেন্ট এবং সম্ভাব্য থ্রেট ভেক্টর নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সেইসাথে এসব থ্রেট মোকাবেলার জন্য সর্বোত্তম পন্থার কথাও বলা হয়। এই সম্মেলনে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সাইবার-সিকিউরিটি পেশাদার, সাংবাদিক, সিটিও, নির্বাহী পদে থাকা ব্যক্তি এবং আরও অনেককে ক্যাসপারস্কি সাইবার-সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এআই-এর বিস্তারের সাথে আসা সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা এবং সাইবার নিরাপত্তা হুমকি নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ দেওয়া হয়। ক্যাসপারস্কির মিশনে সরকারি ও বেসরকারী উভয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যক্তি, ছোট-মাঝারি, এবং বড় ব্যবসা, সবার ডিজিটাল অবকাঠামো সুরক্ষিত করার জন্য ব্যাপক সাইবার নিরাপত্তা পরিষেবা তুলে ধরা হয়।

সম্মেলনটিতে ক্যাসপারস্কির এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আদ্রিয়ান বলেন, “অনায়াসে বড় বড় ডেটা সেট প্রক্রিয়া করার সক্ষমতার জন্য অনেক সংস্থায়, এআই এর অন্তর্ভুক্তিকরণ অনিবার্য। তবে এআই ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডারদের ডেটা কমপ্লায়েন্স সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। গোপনীয় ডেটা কীভাবে ব্যবহার করা হয় এবং সেই ডেটার কোন কোন অংশে এআই দ্বারা কাজ করা যায় সে বিষয়ে নীতিমালা কার্যকর করা দরকার। এর সাথে নিজ নিজ দেশের আইন ও প্রবিধানের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ থাকতে হবে।

আদ্রিয়ান আরো বলেন, “বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সাইবার-রেজিলিয়েন্সি, যা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। সর্বোত্তম সাইবার-রেজিলিয়েন্সির জন্য প্রয়োজন টেলিমেট্রি এবং ইনফরমেশন লগিং যা দ্রুত সমস্যাকে সনাক্ত করে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। সেইসাথে সাইবার আক্রমণের ক্ষেত্রে দ্রুত পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করার জন্য বিস্তৃত নীতিমালা প্রয়োজন।“

ক্যাসপারস্কির গ্লোবাল রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস টিম-এর ডিরেক্টর ইগর বলেন, “র‍্যানসমওয়্যার বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংঘটিত সাইবার অপরাধ। সাইবার অপরাধীরা এটিকে ব্যবসার মতো করে পরিচলনা করে এবং র‍্যানসমওয়্যার-এ্যাস-এ-সার্ভিস (জধধঝ) সেবা প্রদান করে। তাদের যেকোনো সিস্টেমকে আক্রমণ করার প্রধান উপায় হল, দুর্বল অ্যাপ্লিকেশনকে কাজে লাগানো এবং তাতে চুরি করা বা অনুমান করা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা। এতে নতুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, সাপ্লাই চেইন এবং ট্রাস্টেড রিলেশনশিপস। অনেক ক্ষেত্রেই, এসব আক্রমণ ইতোমধ্যে সফল হওয়ার পরেই আবিষ্কৃত হয়। এর মাঝে সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করা হয়েছে, সরকারী সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এবং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।”

ক্যাসপারস্কির লিড ডেটা সায়েন্টিস্ট আলেক্সি আন্তোনভ বলেন, “ক্যাসপারস্কিতে আমরা বহু বছর ধরে এই সমস্ত সমস্যাগুলো নিয়ে গবেষণা করছি যাতে করে আমাদের গ্রাহকদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য সুরক্ষাকবজ তৈরি করা যায়।“

ক্যাসপারস্কি গ্রেট-এর সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ ভিটালি কামলুক বলেন, “মেশিন লার্নিং মডেলের উপর সাপ্লাই-চেইন আক্রমণের মাধ্যমে ট্রেইনিং ডেটাকে এমনভাবে সেট করা হতে পারে যাতে করে এআই মডেলকে ত্রুটিপূর্ণ করে তোলা যায়। যেহেতু এআই বর্তমান বিশ্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই

এই আক্রমণগুলো উল্লেখযোগ্য [illegible] রাখতে পারে।

কৃত্রিম মঙ্গল গ্রহে এক বছর থাকার অভিজ্ঞতা জানালেন চার অভিযাত্রী

দীর্ঘদিন ধরেই মঙ্গল গ্রহে মানুষ পাঠানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা।

কিউরিওসিটি নামের রোভার যান পাঠিয়ে মঙ্গল গ্রহের নানা রহস্য জানার পাশাপাশি গ্রহটিতে মানুষের বেঁচে থাকার কৌশল আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন নাসার বিজ্ঞানীরা।

গবেষণার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনের জনসন স্পেস সেন্টারে মঙ্গল গ্রহের আদলে কৃত্রিম আবাসস্থলও তৈরি করেছেন তাঁরা।

মঙ্গল গ্রহের পরিবেশে এক বছর অবস্থান করে ৬ জুলাই চারজন অভিযাত্রী পৃথিবীর উন্মুক্ত পরিবেশে বের হয়েছেন। শুনিয়েছেন দীর্ঘদিন মঙ্গল গ্রহের পরিবেশ থাকার অভিজ্ঞতা।

স্পেস এজেন্সির ক্রু হেলথ অ্যান্ড পারফরম্যান্স এক্সপ্লোরেশন অ্যানালগ প্রকল্পের আওতায় গত বছরের ২৫ জুন মঙ্গল গ্রহে যান কেলি হ্যাস্টন, আঙ্কা সেলারিউ, রস ব্রকওয়েল ও নাথান জোন্স নামের চার স্বেচ্ছাসেবী অভিযাত্রী।

মঙ্গলগ্রহের আবহে ত্রিমাত্রিক প্রিন্টেড আবাসস্থলে অবস্থান করেন তাঁরা। এ সময় সিমুলেটেড স্পেসওয়াকের মাধ্যমে মঙ্গলের বুকে হাঁটার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাঁরা।

নিজেদের আবাসস্থল রক্ষার পাশাপাশি গত এক বছরে মঙ্গল গ্রহের পরিবেশে শাকসবজিও চাষ করেছেন তাঁরা। মঙ্গল গ্রহের কৃত্রিম পরিবেশে এক বছর থাকার অভিজ্ঞতা জানিয়ে মিশন কমান্ডার হ্যাস্টন বলেন, 'হ্যালো! আপনাদের সবাইকে হ্যালো বলতে পারা আসলেই খুব চমৎকার।

আমাদের ৩৭৮ দিনের বন্দিত্ব দ্রুত কেটে গেছে। মঙ্গল গ্রহে পরিচালিত মিশনের অনুকরণে ১৫৭ বর্গমিটার জায়গায় থাকতে হয়েছে আমাদের। চাঁদের ওপারে মানুষকে নিয়ে যেতে এই মিশন বেশ গুরুত্বপূর্ণ।'

পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহে বার্তা পাঠাতে ২২ মিনিটের মতো সময় লাগে, অভিযাত্রীরাও ২২ মিনিট দেরি করে যোগাযোগের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন।

ভাবুন তো, বন্ধুকে কল করার ২২ মিনিট পর উত্তর পাচ্ছেন। আরও দুটো এমন মিশন পরিকল্পনা আছে। অভিযাত্রীদের সিমুলেটেড স্পেসওয়াকের মাধ্যমে শারীরিক ও আচরণগত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে নাসা।

জনসন স্পেস সেন্টারের ডেপুটি ডিরেক্টর স্টিভ কোরনার বলেন, 'এই অভিযান গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মঙ্গল গ্রহে মানুষ পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছি।

এ জন্য ক্রুদের পুষ্টির বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। অনেক ধরনের পর্যবেক্ষণের মধ্যে থাকতে হয়েছে অভিযাত্রীদের।'

অভিযানের ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার ব্রকওয়েল বলেন, 'উত্তেজনাপূর্ণ ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে এক বছর বেঁচে থাকার এই অবিশ্বাস্য সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।'

নগদ মেগা ক্যাম্পেইনে অংশ নিয়ে আকর্ষণীয় উপহার পেলেন বিজয়ীরা

দেশের সেরা মোবাইল আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান নগদের বৃহত্তম লেনদেন ক্যাম্পেইনের বিভিন্ন পর্যায়ের আরো ৩১ জন বিজয়ীর পুরস্কার হস্তান্তর করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

নগদের প্রায় ২০ কোটি টাকার এই ক্যাম্পেইনের ইতিমধ্যে চারটি দল ও একজন মালয়েশিয়া প্রবাসী বুঝে পেয়েছেন ঢাকায় নিজেদের জমি।

সম্প্রতি নগদের প্রধান কার্যালয়ে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রতিষ্ঠানটির সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চিফ মার্কেটিং অফিসার সাদাত আদনান আহমেদ এবং এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ডেপুটি চিফ মার্কেটিং অফিসার মোহাম্মদ সোলাইমান।

পবিত্র রমজান মাসে প্রতি বছরই দারুণ সব আকর্ষণীয় অফার নিয়ে আসে নগদ। গত বছর ছিল বিএমডব্লিউ, সেডানগাড়ি, মোটরসাইকেল, টিভি, ফ্রিজসহ বিভিন্ন পুরস্কার জেতার সুযোগ।

এবার নগদ ঢাকায় জমি দেওয়ার মাধ্যমে বৃহত্তম লেনদেন ক্যাম্পেইন করেছে এবং গ্রাহকদের বিপুল সারা পেয়েছে। ঢাকায় জমির ক্যাম্পেইনে ইতিমধ্যে পাঁচজনকে জমি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বাকিদেরও জমি বুঝিয়ে দেওয়া হবে। যারা ইতিমধ্যে ক্যাম্পেইনে অংশ নিয়েছেন এবং পুরস্কার জিতে নিয়েছেন, তারা ছাড়া এই ক্যাম্পেইনে পুরস্কার জেতার সুযোগ আর নেই।

কারণ গত ৩০ জুন থেকে ক্যাম্পেইনটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। লেনদেন করে, রেমিট্যান্স গ্রহণ করে এবং দল বানিয়ে টেলিভিশন, ফ্রিজ, এসি, স্মার্ট ফোন পুরস্কার জিতেছেন মো. আরিফুল ইসলাম, মো. জসিম উদ্দিন, মো. মাসুদ খান ও মো. গিয়াসউদ্দিন মোল্লা।

ইনফ্লুয়েন্সার্স ক্যাম্পেইনে অংশ নিয়ে পুরস্কার জিতেছেন রাহাত আহমেদ সীমান্ত ও রিফাত বিন সিদ্দিক। এছাড়া ভিউয়ার্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন শেখ সুফিয়ান ও আফরিন লিজা।

এরকম আরো বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ৩১ জন বিজয়ী মেগা ক্যাম্পেইনের পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। মেগা ক্যাম্পেইনের পুরস্কার বিতরণের সময় নগদের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চিফ মার্কেটিং অফিসার সাদাত আদনান আহমেদ বলেন, 'নগদের মাধ্যমে অনেক মানুষের ঢাকার বুকে জমির মালিক হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।

এছাড়া নগদের এবারের মেগা ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে প্রায় ২০ কোটি টাকার উপহার বিতরণ করেছি আমরা। এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আমরা আমাদের গ্রাহকদের বিপুল সাড়া পেয়েছি, আশা করি ভবিষ্যতে আমরা গ্রাহকদের জন্য এমন আরো দারুণ অফার নিয়ে আসব।'

হ্যাকিংয়ের ইতিহাসে রেকর্ড, ৯৯৫ কোটি পাসওয়ার্ড চুরি

হ্যাকিংয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘিরে গোটা বিশ্বে তোলপাড় শুরু হয়েছে। 'ওবামা কেয়ার' নামে এক হ্যাকার চুরি করা প্রায় ৯৯৫ কোটি পাসওয়ার্ডের একটি সংকলন প্রকাশ করেছে।

এই পাসওয়ার্ডগুলির মধ্যে রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া পার্সওয়ার্ড থেকে ব্যাংকিং পাসওয়ার্ড। এই পাসওয়ার্ড হ্যাকিং রাতারাতি হয়নি।

প্রায় এক দশক ধরে একটু একটু করে এই পাসওয়ার্ড হ্যাক করা হয়। হ্যাক করা পাসওয়ার্ডগুলোতে পুরনো ও নতুন সব ধরনের পাসওয়ার্ডই রয়েছে।

হ্যাকাররা ব্রুট ফোর্স প্রক্রিয়া ব্যবহার করে এই কাজ করেছে। 'দ্য রক ইউ ২০২৪' নামের এই সংকলন একটি বিশেষ ফাইলে নিয়ে তা ক্রাইম ফোরামে তুলে ধরা হয়েছে।
এতে খুব সাধারণ পাসওয়ার্ডও রয়েছে। 'ওবামা কেয়ার' নামের ওই হ্যাকার হ্যাকিংয়ের সময় সাধারণত লিখে থাকে, এই বছরের বড় দিন অনেকটা আগেই এসে গেল, রইল তোমাদের বড়দিনের উপহার।

পাসওয়ার্ড নিয়ে সতর্ক থাকতে ও প্রতারণা থেকে বাঁচতে করণীয়
এত বড় সাইবার অপরাধ গোটা বিশ্বকে নাড়া দিয়ে দিয়েছে। এর আগে ২০২১ সালে 'রক ইউ ২০২১' ফাঁস করেছিল হ্যাকাররা। সতর্ক থাকতে যা করবেন পাসওয়ার্ড একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পাল্টে নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। বছরের কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনকে বেছে নিয়ে সেদিন সব পাসওয়ার্ড পাল্টে ফেলুন।

ব্যাংকের অ্যাপের লগইন পিন, আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত অ্যাপের পিন, ডেবিট কার্ডের পিনও পাল্টে ফেলার কথা বলা হচ্ছে।

এছাড়া আপনি টাকার লেনদেন করেননি কিংবা টাকার লেনদেন হয়ে গিয়েছে- এমন একটি ম্যাসেজ আপনার কাছে আসলে থাকলে অবশ্যই সতর্ক থাকবেন।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় পারমাণবিক ফিউশন চুল্লি তৈরি করেছে ফ্রান্স

১৯টি বিশাল কয়েল দিয়ে তৈরি একাধিক টরয়েডাল চুম্বকের সমন্বয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় পারমাণবিক ফিউশন চুল্লি তৈরি করেছে ফ্রান্স।

ইন্টারন্যাশনাল ফিউশন এনার্জি প্রজেক্ট ফিউশন রিঅ্যাক্টর নামের এই পারমাণবিক ফিউশন চুল্লি তৈরি করতে খরচ হয়েছে ২ হাজার ৮০০ কোটি মার্কিন ডলার।

বিশাল এই চুল্লি তৈরিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ভারতসহ ৩৫টি দেশ সমন্বিতভাবে কাজ করেছে। পারমাণবিক ফিউশন চুল্লি তৈরির কাজ শেষ হলেও এটি ২০৩৯ সাল নাগাদ চালু করা হতে পারে।

ফিউশন আর ফিশন শব্দের মধ্যে কিন্তু বেশ পার্থক্য রয়েছে। ফিউশন পদ্ধতি বর্তমানে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহার করা হয়।

একটি পরমাণুকে বিভক্ত করার পরিবর্তে দুটি পারমাণবিক নিউক্লিয়াসকে যুক্ত বা ফিউজ করে এ পদ্ধতি। আর তাই নতুন এই চুল্লিতে ফিউশন শক্তির মাধ্যমে জ্বালানি তৈরি করতে চান বিজ্ঞানীরা।

এর মাধ্যমে বৈশ্বিক জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় ভূমিকা রাখতে চান তাঁরা। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, বিশাল এই চুল্লিতে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী চুম্বক রয়েছে।

এই চুম্বকের চৌম্বকক্ষেত্র পৃথিবীকে ঘিরে রাখা চৌম্বকক্ষেত্রের চেয়ে ২ লাখ ৮০ হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী। গত ৭০ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক ফিউশনের শক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন।

এই প্রক্রিয়ায় হিলিয়াম তৈরি করতে খুব বেশি উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুকে ফিউজ করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় নক্ষত্র পদার্থকে আলো ও তাপে রূপান্তরিত করে।

এই প্রক্রিয়ায় কোনো গ্রিনহাউস গ্যাস বা দীর্ঘস্থায়ী তেজস্ক্রিয় বর্জ্য উৎপাদন হয় না। ফিউশন রিঅ্যাক্টরের নকশায় টোকামাক নামের বিশেষ একটি যন্ত্র থাকে।

এই যন্ত্রে শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রসহ একটি ডোনাট আকৃতির চুল্লি থাকে। চেম্বারের ভেতরে প্লাজমা উত্তপ্ত করা হয়। পারমাণবিক ফিউশন ঘটানোর জন্য প্লাজমার কয়েল অনেক সময় ধরে রাখা বেশ চ্যালেঞ্জিং।

গোপালগঞ্জে স্ক্র্যাচ প্রোগ্রামিং ভাষার উপর ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রোগ্রামিং শিক্ষাকার্যক্রমের সহায়ক হিসেবে তৈরী এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের শিক্ষকদেরকে স্ক্র্যাচ প্রোগ্রামিং এ আরো বেশি দক্ষ করার উদ্দেশ্য নিয়ে গত ৫-৬ ই জুলাই, ২০২৪ তারিখে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সদর উপজেলার ১১৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো স্ক্র্যাচ প্রোগ্রামিং ভাষার উপর ০২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ, স্ক্র্যাচ বাংলাদেশের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রথম পর্বের সহযোগিতায় ছিল সিএসএল টেকনোলজিস লিমিটেড এবং বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (বিডিওএসএন)।

এ কর্মশালার প্রথম পর্বের সমাপনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহসিন উদ্দীন বলেন,"বর্তমানে ইন্টারনেটের এই যুগে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর সময় নষ্টকারী কন্টেন্ট এর আধিক্য দেখা যাচ্ছে।

এর মাধ্যমে আমাদের বাচ্চাকাচ্চাদের মেধা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিনষ্ট হচ্ছে। স্ক্র্যাচ প্রোগ্রামিং সম্পর্কিত ইউটিউব কন্টেন্টগুলো দেখার পাশাপাশি নিয়মিত প্রাকটিসের মাধ্যমে আমাদের সন্তানরা এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার পরিমল চন্দ্র বালা, সহকারী শিক্ষা অফিসারগণসহ আয়োজক হিসেবে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার পক্ষ থেকে গোবরা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম চৌধুরী টুটুল উপস্থিত ছিলেন।

দুইদিনের এই কর্মশালায় ব্লকভিত্তিক প্রোগ্রামিং ভাষা স্ক্র্যাচ দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে প্রোগ্রামিং ও গণিতের ধারণা দিয়ে বিভিন্ন যুক্তি ব্যবহার করে গেইম এবং এনিমেশন তৈরি করার বিষয়গুলো হাতেকলমে দেখানো হয়।

শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এ প্রোগ্রামিং কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা নিয়ে তাদের উচ্ছাস প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে নিলখী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হাফিজা খানম বলেন,"স্ক্র্যাচ প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে বাচ্চারা যুক্তিভিত্তিক সমস্যা সমাধানে আগহী হবে এবং এটি তাঁদের মোবাইল আসক্তি দূর করে গঠনমুলক কর্মকান্ডে উৎসাহিত করবে।

এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার নিয়মিত আয়োজন দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রোগ্রামিং শিক্ষাকার্যক্রমে সহায়ক হওয়ার পাশাপাশি দেশের সকল স্তরের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রোগ্রামিং ভীতি দূর করে জটিল সমস্যা সমাধানে আগ্রহী করে তুলবে বলে বিশ্বাস করেন বিডিওএসএন এর সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান।

উল্লেখ্য, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ২২৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রথম পর্বে ১১৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

প্রথম পর্বে প্রত্যেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে একজন করে আইসিটি শিক্ষক এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী ধাপে বাকি ১১৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণদের নিয়ে কর্মশালার দ্বিতীয় পর্ব আয়োজন করা হবে।

উভয়দিনই সকাল ১০ টা থেকে শুরু হয়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা শেষে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিজ নিজ বিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ব্লকভিত্তিক প্রোগ্রামিং ভাষা সম্পর্কে ধারণা দিবেন।

অনলাইনে পণ্য বিক্রি করে সফল টাঙ্গাইলের নারী উদ্যোক্তা

জেলায় অনলাইন ভিত্তিক নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা দিন দিন বাড়ছে। গত তিন-চার বছর ধরে পোশাক, আচার, কেকসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য, অর্গানিক অয়েল, কসমেটিক্স, জুয়েলারী, কাসা ও পিতলের জিনিসপত্র, মাটির তৈরি জিনিসপত্র, পাটের তৈরি জিনিসপত্রসহ নানান পণ্যের জনপ্রিয়তা বেড়ে চলেছে।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম উইমেন এন্ড ইকমার্স ট্রাস্ট ফোরাম (উই) ফেসবুক ভিত্তিক পেইজে যুক্ত হয়ে ব্যবসা পরিচালনায় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন জেলার অনেক নারী উদ্যোক্তা।

এতে ঘরে বসেই পরিবারের কাজের পাশাপাশি বাড়তি আয়ের সুযোগ পাচ্ছেন তারা। অল্প পুঁজিতেই নারীরা অনলাইন ব্যবসার মাধ্যমে সফল হয়েছেন।

কেউ কেউ ৮০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা আয় করছেন। জেলার প্রায় দুই শতাধিক নারী উদ্যোক্তা এভাবে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছেন। দিন দিন বাড়ছে এদের সংখ্যা।

স্থানীয়ভাবে মূলতঃ অনলাইনে মানুষের খাদ্যপণ্য ও পোশাকের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে করোনাকালীন সময়ে অনেক নারীই ঘরে বসে উদ্যোক্তা জীবন শুরু করেন। যা এখনো ধরে রেখেছেন নারী উদ্যোক্তারা।

জেলার সখীপুর উপজেলার নারী উদ্যোক্তা সানজিদা আহমেদ জুই একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে জেলা ও জেলার বাইরে বেশ পরিচিতি পেয়েছেন।

তিনি বলেন, আমার ছোট বেলা থেকে ইচ্ছে ছিল পড়াশোনার পাশাপাশি কিছু একটা করবো। কোথাও চাকরি করলে অন্যের অধীনে কাজ করতে হয়।

আমার লক্ষ্য ছিল অন্যের অধীনে কাজ না করে নিজে নিজে কিছু একটা করার। ২০২০ সালের দিকে করোনাকালে 'উই' নামের একটি ফেসবুক গ্রুপ খুঁজে পাই।

আমার স্বামী ও বাবা-মার কাছে পরামর্শ নিয়ে ২০২১ সালের এপ্রিল মাসের শেষদিকে কাঁথাসহ ছোট বাচ্চাদের পোশাক নিয়ে কাজ শুরু করলাম।

একটি ফেসবুক পেইজ খুললাম। প্রথম দিনেই অর্ডার আসে অন্য জেলা

থেকে। প্রথম বিক্রি ছিল মাত্র ৫০০ টাকা। এতে কাজের প্রতি উৎসাহ পাই। শুরু হলো কাজ করা।

আমার ৯৫ ভাগ পন্য বিক্রি হয় অনলাইনে, আর ৫ ভাগ বিক্রি হয় অফলাইনে। এখন প্রতি মাসে আমার ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকার পণ্য বিক্রি হয়।

লাভ থাকে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা। বর্তমানে আমার প্রতিষ্টানে প্রায় ৫০জন নারী কর্মীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

আমি নকশি কাথা, সরিষার বালিশ, শিমুল তুলার বালিশ, ফ্যামেলি কম্বো ড্রেস, পাটের ব্যাগ, হাতের কাজের জুয়েলারিসহ বিভিন্ন রকমের পণ্য নিয়ে কাজ করি।

মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় ও বিসিক থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণও নিয়েছি। পৌর শহরের পশ্চিম আকুর-টাকুর পাড়া এলাকার নারী উদ্যোক্তা নাহিদা ইসলাম বলেন, ২০১৮ সালের দিকে পোশাক নিয়ে কাজ করে ভালোই চলছিল।

তারপর আমার বাচ্চা হলে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি বলেন, দুই বছর আগে করোনার সময় অনেকের দেখাদেখি আমিও অনলাইনে যুক্ত হয়ে জোড়ালোভাবে ব্যবসা শুরু করলাম।

এখন অনলাইনে বিভিন্ন খাদ্যপণের ব্যবসা করেছি। বর্তমানে সংসারে কাজের ফাঁকে আমি সব ধরনের বাংলা খাবার, চিকেন ফ্রাই, বিফ কারি, ভেজিটেবলস, সালাদ, বিভিন্ন ধরনের বিরিয়ানী, পোলাউ, শর্মাসহ অর্ডার মোতাবেক বিভিন্ন মজাদার খাবার তৈরি করি। বি

য়ে অনুষ্ঠানসহ বিভিন্নে অনুষ্ঠানের খাবারেরও অর্ডার নিয়ে থাকি। কাজ করতে পারলে প্রতিমাসে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব। তবে এ ক্ষেত্রে পরিবারের সহায়তা প্রয়োজন।

অর্গানিক প্রোডাক্ট বিডি'র স্বত্বাধিকারী ও কলেজ ছাত্রী ঋতু বর্ণা বলেন, আমি গত তিন বছর ধরে লেখাপড়ার পাশাপাশি অনলাইনে অর্গানিক হেয়ার অয়েল, অর্গানিক হেয়ার প্যাক, অর্গানিক ক্রিম, অর্গানিক বডি লোশন ও ঝাল মুড়ির মসলার ব্যবসা করছি।

ভালোই সাড়া পাচ্ছি। আমাদের 'উইমেন এন্ড ই-কমার্স ট্রাস্ট ফোরাম (উই) নামে একটি গ্রুপ রয়েছে, ফেইজবুকে যার সদস্য ১ মিলিয়নের উপরে।

এটা আমাদের অনলাইনে ব্যবসার একটি বড় প্লাটফর্ম। এর মাধ্যমে অনেক বিক্রেতারাই পণ্য বিক্রি করছেন সহজে। আমাদের নিজস্ব ফেসবুক পেইজেও পণ্যের ছবি দিয়ে থাকি, ওখান থেকেও ভালো সাড়া পাচ্ছি।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মানুষই অনলাইনের প্রতি ঝুঁকছেন, এতে এই খাত আরো বড় হচ্ছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি অনলাইন থেকে বাড়তি আয় হচ্ছে।

বর্তমানে আমার মতো অনেক ছাত্রী অনলাইন ব্যবসায় যুক্ত হচ্ছেন। আমাদের যদি সরকারিভাবে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে আরও এগিয়ে যেতে পারবো।

চাকরি পিছনে না ছুটে নিজেরাই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবো। উই'র টাঙ্গাইল জেলা প্রতিনিধি ও 'স্বপ্নের সন্ধানে' নামের একটি পেইজের স্বত্বাধিকারী মাহবুবা খান জ্যোতি বলেন, বাসায় স্বামীকে খাওয়ানোর জন্য আচার করে সেই ছবি ফেসবুকে দিয়েছিলাম।

আর সেখান থেকেই অর্ডার পাই বেশ কয়েক ধরনের আচারের। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। মাত্র ২৬০ টাকার পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করে এখন প্রতি মাসে প্রায় লাখ টাকা আয় করছেন জ্যেতি।

সংসার সামলেও ব্যবসায়ীর খাতায় নাম লিখিয়েছেন এই নারী উদ্যোক্তা। বর্তমানে তিনি টাঙ্গাইল পৌর শহরের পূর্ব আদালত পাড়া এলাকার একজন পরিচিত মুখ।

জ্যোতির কাছে মিলবে পছন্দ অনুযায়ী ঘরে তৈরি স্বাস্থ্যকর কেক, বিভিন্ন রকমের আচার, আমসত্ত্ব, হাতের তৈরি ডিজাইনের শাড়ি, পাঞ্জাবি ও বাচ্চাদের ফতুয়া। খাবারসহ বিভিন্ন পণ্য নিয়ে কাজ করছেন তিনি।

জ্যোতি বলেন, ২০২০ সালের প্রথম দিকে জয়েন করেছেন 'উই' নামক ফেসবুক গ্রুপে। গ্রুপটিতে যুক্ত হওয়ার পর জানতে পারেন ক্ষুদ্র ব্যবসার ইতিবৃত্ত।

প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করতে শুরু করেন আচার, আমসত্ত্ব। ইতোমধ্যে তার আমসত্ত্ব সাড়া ফেলেছে টাঙ্গাইলসহ বিভিন্ন জেলায়। দেশের বাইরেও এর কদর বেড়েছে। আমসত্ত্ব ও আচারের গুণগত মান নিয়ে সন্তুষ্ট তার ভোক্তারা। তাই অর্জন করেছেন টাঙ্গাইলের 'আমসত্ত্ব জ্যোতি' খেতাব।

ক্রেতাদের কাছ থেকেই পেয়েছেন এ নাম। তবে টাঙ্গাইলসহ বিভিন্ন জেলা ও বিদেশে ডেলিভারি দিয়ে থাকেন তিনি। এটাকে আরও প্রসারিত করার চিন্তা তার।

তিনি বলেন, আমাদের টাঙ্গাইলে প্রায় ২২০ জন নারী উদ্যোক্তা কাজ করছেন। বিসিক থেকে আমাদের ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করা হয়।

নারী উদ্যোক্তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে থাকে বিসিকি। টাঙ্গাইল জেলা বিসিক কার্যালয়ের শিল্প নগরী কর্মকর্তা জামিল হুসাইন বলেন, দিন দিন টাঙ্গাইলে নারী উদ্যোক্তা বাড়ছে।

নারীরা অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন ব্যবসায় জড়িত হয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। তাদেরকে বিসিক থেকে ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করা হয়।

ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা বাড়াতে আউটলুকে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসছে মাইক্রোসফট

মাইক্রোসফট ব্যবহারকারীদের নিরাপদ রাখতে আউটলুকে বেশ কিছু পরিবর্তন আনার ঘোষণা দিয়েছে। এসব পরিবর্তনের ফলে শিগগিরই আউটলুকের বেসিক অথেনটিকেশন সমর্থন সুবিধা বন্ধের পাশাপাশি আউটলুকের 'লাইট' সংস্করণ মুছে ফেলা হবে।

আউটলুকের সঙ্গে জিমেইল অ্যাকাউন্টও যুক্ত করতে পারবেন না ব্যবহারকারীরা। মাইক্রোসফটের তথ্যমতে, ই-মেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশের জন্য ব্যবহৃত বেসিক অথেনটিকেশন প্রযুক্তির নিরাপত্তা তুলনামূলক কম।

আর তাই আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে আউটলুকে বেসিক অথেনটিকেশন সমর্থন সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর আউটলুকে আধুনিক অথে নটিকেশন মেথড ব্যবহার করা হবে।

ফলে অ্যাকাউন্টে প্রবেশের জন্য ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড ছাড়াও একাধিক পদ্ধতিতে ব্যবহারকারীদের পরিচয় যাচাই করা হবে। এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা বর্তমানের তুলনায় আরও বাড়বে।

আউটলুকের লাইট সংস্করণের ওয়েব অ্যাপ মুছে ফেলা হবে আগস্টের ১৯ তারিখে। লাইট সংস্করণটি মুছে ফেলার পর ব্যবহারকারীকে বাধ্যতামূলকভাবে আউটলুক ওয়েব অ্যাপের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ ব্যবহার করতে হবে।

এটি অ্যাকাউন্টকে আরও সুরক্ষিত রেখে বাড়তি নিরাপত্তা দেবে। এ ছাড়া আউটলুকে এখন জিমেইল অ্যাকাউন্ট যুক্ত করার সুযোগ থাকলেও ৩০ জুন এ সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে।
এর ফলে আউটলুকের মাধ্যমে আর জিমেইলে প্রবেশ করা যাবে না। আউটলুকের পার্টনার গ্রুপ প্রোডাক্ট বিভাগের ব্যবস্থাপক ডেভিড লস বলেছেন, নতুন এসব পরিবর্তন আসার পর আউটলুক ব্যবহারের জন্য উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদের অবশ্যই উইন্ডোজ ১০ থেকে পরবর্তী সংস্করণের অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে।

মাইক্রোসফট এজ ও ক্রোম ব্রাউজারের সর্বনিম্ন ৭৯ সংস্করণ এবং ফায়ারফক্স ব্রাউজারের সর্বনিম্ন ৭৮ সংস্করণ ব্যবহার করতে হবে।

লজিটেক নিয়ে এসেছে তারহীন বাংলা কি-বোর্ড ও মাউস

লজিটেক নিয়ে এসেছে কমপিউটারে দ্রুত বাংলা লেখার সুযোগ দিতে তারহীন বাংলা কি-বোর্ড ও মাউসের কম্বো। গত মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে 'লজিটেক এমকে২২০' মডেলের তারহীন বাংলা কি-বোর্ড ও মাউস উন্মোচন করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

অনুষ্ঠানে লজিটেকের দক্ষিণ এশিয়া ফ্রন্টিয়ার মার্কেটের বিটুবি ও বিটুসি বিভাগের প্রধান পার্থ ঘোষ বলেন, 'বাংলাদেশের বাজারে লজিটেকের তারহীন বাংলা কি-বোর্ড ও মাউসের কম্বো আনতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বিজয় বায়ান্নর লেআউট দিয়ে তৈরি করা কি-বোর্ডটি পানিরোধক হওয়ায় স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়। ২.৪ গিগাহার্টজের একটি ডঙ্গলের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১০ মিটার দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কি-বোর্ড ও মাউসটি। ফলে কি-বোর্ড ও মাউসটির মাধ্যমে বাসা বা কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ করা যাবে। তবে এটি গেমারদের জন্য নয়।' অনুষ্ঠানে জানানো হয়, তারহীন বাংলা কি-বোর্ড ও মাউসটিতে রয়েছে শক্তিশালী অ্যালকালাইন ব্যাটারি।

ফলে কি-বোর্ডটির ব্যাটারি ২৪ মাস ও মাউসের ব্যাটারি ১২ মাস পর্যন্ত একটানা ব্যবহার করা যাবে। তারহীন কি-বোর্ড ও মাউস কম্বোটির দাম ধরা হয়েছে ২ হাজার ২৪৯ টাকা।